দেবীবালা।

সামাজিক উপন্যাস।

৪৪ নং মস্‌জিদ্‌ বাড়ী ষ্ট্রীট, বেঙ্গল
লাইব্রেরী হইতে
শ্রীকালীমোহন ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা;

২৮০ নং অপার চিৎপুররোড্‌ শোভাবাজার
সূর্য্যপ্রেসে
শ্রীহরিচরণ বৈরাগ্য দ্বারা মুদ্রিত।
সন ১৩০৭ সাল।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

দেবীবালা।

উপন্যাস।

প্রথমপরিচ্ছেদ।

যুবক-যুবতী।

চৈত্রমাস, বসন্ত কাল, রাত্র প্রায় দশটা হইয়াছে। আজ শুক্লপক্ষীয় পঞ্চমী তিথি; চন্দ্রদেব পশ্চিম গগণে সমস্ত জগৎ অন্ধকারময় করিয়া, অস্তগিরি শিখরে আরোহণ করিতেছেন। এখনও সরোবরে কুমদিনী হেলিয়া দুলিয়া মনোহ্লাসে খেলা করিতেছে।

জগৎ নিরব, কোন স্থানে একটি প্রাণীর সারা শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না। জীবগণ দিবাভাগে আপন আপন কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া ক্লান্ত হইয়াছিল; এখন স্নেহময়ী যামিনী মাতার সুবিমল ক্রোড়ে বিশ্রাম-সুখানুভব করিতেছে। কেবল পেঁচক প্রভৃতি দুই একটি রাত্রি-চর পক্ষী মধ্যে মধ্যে ইতস্তত বেড়িয়া বেড়াইতেছে; আর প্রভু-ভক্ত কুকুর-সমূহ কর্ণ-স্থির করিয়া আপন আপন প্রভুর বাটীর পাহাড়া দিতেছে; কোন স্থানে একটু শব্দ হইবা মাত্র ভেউ ভেউ করিয়া লাফাইয়া যামিনীর

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। মৃদুল মলয়ানীল বিটপিশ্রেণীর উপর দিয়া শোঁ শোঁ শব্দে আস্তে আস্তে বহিয়া বসন্তের অপার মহিমা বিস্তার করিতেছে। আহা! প্রকৃতী-সতী এই সময়ে কি মধুর ভাবই ধারণ করিয়াছেন।

দেখিতে দেখিতে চন্দ্রদেব অস্তমিত হইলেন, আকাশের পশ্চিম কোণে এক খানা ক্ষুদ্র মেঘ উঠিল, অল্প সময় মধ্যেই সেই ক্ষুদ্র মেঘ খণ্ড বৃহৎ আকার ধারণ করিয়া গগণ আবৃত করিল, সমস্ত জগৎ অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইল।

এমন সময়ে গোপালপুর গ্রামের এক গৃহস্তের বাটীস্থিত এক খানা ক্ষুদ্র গৃহে তক্তপোষের উপর বসিয়া একটি যুবতী বিষম চিন্তা-সাগরে ভাসমান হইতেছে।

যুবতী বড়ই সুন্দরী; এই মাত্র তাহার দেহটি ষোল কলায় পুর্ণ হইয়া সম্পূর্ণ রূপে বিকশিত হইয়াছে। হায়! আজ এ হেন প্রস্ফুটিত কুসুমে চিন্তা-কীট প্রবেশ করিয়া কুসুমটি মলিন করিয়া তুলিয়াছে। তাহার বদন কমল বিবর্ণ হইয়াছে। যদি ও আজ বিষম চিন্তার কারণ তাহার যৌবনের সেই ঢল ঢল ভাব নাই, অধর প্রান্তে ঈষৎ হাসি নাই, নয়নের সেই চঞ্চল ভাব ভঙ্গী নাই, হৃদয়ে স্ফুর্ত্তি নাই, বদনের উজ্জলতা নাই; কিন্তু তথাপিও যেন তাহার রূপ ফাঁটিয়া বাহির হইতেছে। যুবতীর মুখ খানি বড়ই সুন্দর; তাহা লিখিয়া দেখান যায়না, না দেখিলে বিশ্বাস হয়না, সেই মুখ খানার উপর ভাসা ভাসা দুটী চোক, তাহাতে বিষাদের ছায়া পতিত হইয়া বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল; তাহার উপরি ভাগে ঈষৎ বঙ্কিম ভ্রূ যুগল নিবিড় নীরদাকে স্থির সৌদামিনীর ন্যায় সেই পটল চেরা চোক

দুটী অতীব সুশ্রী দেখাইতেছিল। আলুলায়িত ঘোর কৃষ্ণ-বর্ণ কেশ জালের মধ্যে ঐ সুন্দর মুখ খানি বড়ই শোভা পাইতেছিল। হায়! আজ এ হেন সুন্দরীর হৃদয়ে কেন চিন্তা-কীট প্রবেশ করিল? পূর্ণ শশধরে আজ কেন অসময়ে রাহু গ্রাস করিল? নিদয় বিধি এ কোমল হৃদয়ে কেন চিন্তাগ্নি প্রদান করিলেন?

যুবতী বড়ই অস্থির, গৃহের এক পার্শ্বে মৃত্তিকার উপর অঞ্চল পাতিয়ে একটি পৌঢ়া ঘোর নিদ্রায় অভিভূতা; তাহার নাক ডাকা শব্দ হঠাৎ আগন্তুক লোক শ্রবণ করিলে, তাহার অন্তরে বিষম ভয়ের উদয় হয়। যুবতীর উপাধানের সন্নিকটে একটী ক্ষীণ আলো নিব্ নিব্ করিয়া জলিতেছে। কিয়ৎ কাল পর যুবতী একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, জানালা দ্বারা বাহিরের দিক দৃষ্টি পাত করিয়া দেখিল, জগৎ অন্ধকার ময়; কোনস্থানে কিছু দৃষ্টি গোচর হয় না, সে তখন এরূপ আঁধার দেখিয়া আর স্থির চিত্তে থাকিতে পারিল না, নিদারুণ যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতে লাগিল। চোক্ দুটী যেন নিশীর শিশিরাক্ত নীলোৎপলের ন্যায় ছল্ ছল্ হইয়া উঠিল; ক্রমে দুই একবিন্দু করিয়া মুক্তাফল সদৃশ অশ্রু-জল গড়াইয়া তাহার বক্ষস্থল ভাসা-ইতে লাগিল। সে তখন ভয় ও বিষম ভাবনায় জড়িত কণ্ঠে করুণ স্বরে গৃহস্থিতা নিদ্রিতা প্রৌঢ়াকে "বামা বামা" বলিয়া ডাকিল। বামা হস্ত দ্বারা নয়ন মার্জ্জনা করিতে করিতে উঠিয়া বসিল এবং যুবতীকে ঐ রূপ অবস্থায় দেখিয়া বলিল "কিগো! কি হ'য়েছে?

যুবতী। বড় মেঘ উঠেছে সমস্ত জগৎ অন্ধকারময়; বাহিরে কান স্থানে পথ, ঘাট কিছু দৃষ্টি গোচর হয়না, আমার বড় ভয় হইতেছে

যুবক যুবতী।

বামা। তুমি ঘরে শু'য়ে আছ তোমার ভয় কি?

যুবতী। তাঁহার আজ নিশ্চই বাড়ী আসিবার কথা তিনি এ অন্ধকারে আসিবেন কেমন করে?

বামা। আজ সে রমণ পুর হইতে নিশ্চই বাড়ী আসিবে তাহা তুমি কি করে জান্‌লে?

যুবতী। তিনি আজ নিশ্চই আসিবেন, সকাল বেলা লোক পাঠায়েছেন, কাল তাঁহার সকালেই মহলে যে'তে হবে।

বামা। তার কি প্রাণের ভয় নাই যে সে এত রাত্রে এরূপ মেঘ দেখেও রমণপুর থেকে রওনা হবে, আমি নিশ্চয় বল্লেম্ আজ সে এই মেঘ দেখে কখনও রাস্তায় বাহির হবে না।

যুবতী। তোর মুখে ফুল চন্দন পরুক, মা মঙ্গল চণ্ডীর কৃপায় আজ তিনি রমণপুর হইতে রওণা না হ'য়ে থাকেন হবেই ভাল, আর যদিও রওণা হ'য়ে থাকেন; তবে যেন বিপদ-নাশিনী ভবানীর কৃপায় কোন বিপদে না পরেন।

বামা। নেও আর ব'কো না এখন সুস্থির হ'য়ে ঘুমা'য়ে থাক, কা'ল সর্ব্বমঙ্গলার পূ'জা ক'রো।

যুবতী। তা করবো বই কি আজ তাঁহার কোন বিপদ না হইলে নিশ্চয়ই কা'ল মার' পূজো করিব।

দু'জনে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, ইতি মধ্যে অদূরে চট্ মট্ করিয়া চর্ম্মপাদুকারশব্দে একটী মনুষ্যের আগমন বার্ত্তা জ্ঞাপন করিল। ক্রমে সেই শব্দ দরজার নিকট আসিয়া ক্ষান্ত হইল। তখন জুতার শব্দ ক্ষান্ত হইয়া সেই স্থলে মানুষের কণ্ঠ স্বরে পরিণত হইল। বাহির হইতে পুং কণ্ঠে বলিল "বামা বামা ও বামা, বলি বামা ঘুমিয়েছ নাকি"?

"না অধিক রাত হয়নাই কিনা তাই এখনও ঘুম হয় নাই, তুমি দেখ্‌ছি আচ্ছাছেলে, এত রাত্রে এই মেঘ মাথায় করে এলে কেমন করে, ধন্য ছেলে ধন্য তোমাদের প্রেম এখন তুমি এলে আমি রক্ষা পেলেম"। এ কথা বলিতে বলিতে গৃহ মধ্য হইতে বামা দরজা খুলিয়া দিল। একটি বিংশতি বর্ষীয় সুন্দর যুবক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। গৃহস্থিতা যুবতী ঈষৎ ঘোমটা টানিয়া একপার্শ্বে লজ্জিতা ভাবে দাঁড়াইল। যুবক পূর্ব্বোক্ত তক্তপোষের উপর উপবেশন করিলে, পৌঢ়া আবার বলিতে লাগিল, "তোমার এত রাত হ'লো কেন? এই মাথার উপর মেঘও কি চো'খে দেখিতে পাও না।"

যুবক। তা কি করব বামা, পরের কাজ কত্তে হয়।

বামা। তা আজ বাড়ী না এলেই হ'তো।

যুবক। কাল সকালেই মহলে যেতে হবে তাতেই আজ এত তাড়াতাড়ি করে বাড়ী আসিতে হয়েছে।

বামা। তোমার সঙ্গে কথায় পারি আমার এরূপ সাধ্য নাই, আমরা সব বুঝি। আচ্ছা প্রণয় তোমাদের "যেমনি দেবা তেমনি দেবী" এখন তুমি এলে আমি রক্ষা পেলেম, দেবীর প্রাণও শীতল হ'লো, আমি এখন চল্লেম।" এই কথা বলিয়া বামা প্রস্থান করিল। যুবতী ও ঘোমটা কিঞ্চিৎ অপসারিত করিলেন। যুবতীর সেই সুন্দর মুখ খানি বস্ত্র মধ্য হইতে বড়ই সুন্দর দেখাইতে ছিল; যেন নিবিড় ঘন জালে বেষ্টিত হইয়া পূর্ণ চন্দ্র শোভা পাইতেছে। এখন তাহার বদন মণ্ডলে সেরূপ কোন বিষাদের চিহ্ন নাই; এখন অধর প্রান্তে ঈষৎ হাঁসি দেখা দিয়াছে।

পাঠক যদি আপনারা রূপবতীর রূপে মুগ্ধ হইতে ইচ্ছা করেন, যদি কামিনীর মন-মোহিনী রূপ দর্শন করিয়া, নয়নের পিপাসা

নিবৃত্তি করিতে বাঞ্ছা থাকে; তবে এই সময়ে এক বার আমার সহিত আসুন, এই মন-মুগ্ধ কারিণী যুবতীর নিকট উপস্থিতা হইয়া অনিমেষ নয়নে ইহার রূপ দর্শন করিয়া আসি। যদি বলেন "সেই যুবতীর নিকট যাই কেমন করে"? গ্রন্থকারের অগম্য স্থান নাই; স্বর্গীয় নন্দন কাননাবধি করিয়া, মহা পাপীর আবাস স্থান ঘোর নরক পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই গ্রন্থকারের গমনাগমন আছে। রাজ অন্তপুর বাসিনী রাজকন্যা ও রাজরাণীর অন্তরে থাকিয়াও অন্তরের কথা সমস্ত অবগত হইতে পারেন। গ্রন্থকারের কৃপাতেই আজ পাঠক সেই যুগযুগান্তরের এবং গ্রন্থকারের কল্পনা প্রসূত সুন্দরী রমণার রূপ, চরিত্র এবং প্রণয় প্রভৃতি দর্শন করিয়া অপার আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন; শকুন্তলার রূপ দর্শনকরিয়া যে, আপনি বিমোহিত হইয়াছেন, ইহার কারণ কি কালিদাস নয়? কালিদাসের হস্তস্থিত লেখনী যদি শকুন্তলা নাটক না লিখিত, তবে কি আজ কেহ শকুন্তলার রূপ ও চরিত্র দর্শন করিতে সমর্থ হইতেন। শকুন্তলাক কালিদাসের চাক্ষস্ প্রত্যক্ষ্য হইয়া ছিল? না কালিদাসের নিকট তাহার জীবনের সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া ছিল? তা নয়, কালিদাস কবি; কবির ক্ষমতা অসীম, সেই ক্ষমতাতেই কালিদাস শকুন্তলার রূপ ও চরিত্র বর্ণনা করিয়াছিলেন। বাজে কথায় অনেক দূর আসিয়া পরিলাম আর পাঠককে অধিক বিরক্ত করিতে ইচ্ছা করিনা, পাঠকের আর একটী আপত্তির বিষয় উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইব। অনেকেই বলিতে পারেন যে, আমরা কুল-কামিনীর রূপ দর্শন করিয়া মোহিত হইব কেন"? সেক্সপিয়রের "জুলিয়তের" রূপ দেখিয়া মোহিত হ'ন কেন? কালিদাসের শকুন্তলা, বঙ্কিমের আয়েসা ও

কুন্দনন্দিনীর রূপ দেখিয়া মোহিত হ'ন কেন? আর না হইয়াছে।

বামা গৃহ হইতে প্রস্থান করিলে পর প্রথমে যুবক যুবতীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "দেবীবালা! তুমি এখনও ঘুমো'ও নাই"।

দেবীবালা। না আজ এখনও ঘুম হয় নাই।

যুবক। তুমি আমার জন্য যে, এপর্য্যন্ত নিতান্ত ব্যাকুলিত চিত্তে কাল কাটাইয়াছ, তাহা আমি পূর্ব্বেই বুঝে ছি। স্বামীর বিপদাশঙ্কা মনে হ'লে কি আর তোমার ন্যায় সতী স্ত্রী স্থিরচিত্তে থাকিতে পারে? আহা! তোমার এই কমনীয়-কান্তি কেবল আমার জন্যই ভাবিয়া ভাবিয়া মলিন হইয়াছে, হায়, হায়! আমি এরূপ দুর্ভাগা যে, এই রত্ন সদৃশা স্ত্রী পাইয়াও এক দিবসের জন্য সুখী হইতে পারিলাম না এবং তোমাকেও সুখী করিতে সমর্থ হইলাম না। বিধাতার কি অবিচার যে, এরূপ সর্ব্বগুণসম্পন্না সুশীলা রাজ-রাণী সদৃশা ভুবন-মোহিনীর অদৃষ্টে এত কষ্ট লিখে ছিলেন।

দেবীবালা। আপনি আমার কষ্টের কারণ কি দে'খছেন? আমি জানি আমার ন্যায় সুখী রমণী অতি বিরল। রমণীকুলের স্বামী অপেক্ষা প্রিয় জন আর এ জগতে কে আছে? যে রমণী পতির আদরে আদরিণী তাহার পক্ষে শত যাতনা সত্বেও এ সংসার নন্দন কানন, তাহার পক্ষে সংসার স্বর্গীয় সুখ নিকেতন। আর যে দুর্ভাগিনী স্বামীর ভালবাসা হইতে বঞ্চিত; যে দুর্ভাগিনীর হৃদয় স্বামীর হৃদয়ের সহিত মিলিত না হয়, সংসার তাহার পক্ষে ঘোর রৌরব তুল্য। স্বামী ভালবাসা ব্যতীত শত সহস্র প্রকারেও রমণী হৃদয়কে সুখী করিতে পারে না।

যুবক। দেবীবালা! তোমার ন্যায় রমণীর মুখে এ কথা শোভা পায় বটে; সতী স্ত্রী যে স্বামীর ভালবাসা ব্যতীত অন্য কিছুর প্রার্থনা করেনা, তাহারা যে এক মাত্র পতির ভালবাসার ভিখারিণী, তাহা আমি অবগত আছি; কিন্তু আমি তোমাকে সেরূপ ভালবাসা দেখাইতে পারি কৈ? তোমার নিকট দু দণ্ড থাকিয়া সুখী হইতে পারি কৈ? সংসারে তোমার এত যন্ত্রণা দেখিয়াও তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করি কৈ? দেবীবালা! তুমি সংসারে এত যন্ত্রণা ভোগ করিয়া সর্ব্বদা কষ্ট পাও তা আমি সকলই জানি; যদিচ তুমি তোমার কষ্টের কথা, আমি দুঃখিত হইব বলে আমার নিকট এক দিনের জন্যও ব্যক্ত কর নাই; কিন্তু তথাপিও আমি সমস্ত বুঝিয়াছি। তুমি দিবা রাত্র সংসারের এত কার্য্য করিয়াও এক দিনের জন্য মাতার নিকট আদর পাওনা। হায়! যিনি মনোহর অট্টালিকার মধ্যে অতীব কোমল শয্যায় শয়ন করিতেন এবং দাস দাসী গণে নিয়ত যাঁহার পদ সেবা করিত ও পিতা মাতায় কত স্নেহে নানাবিধ ভোজ্য বস্তু ভোজন করাইতেন; এখন কিনা সেই কোমলাঙ্গিনী সমস্ত দিবস ক্রীত দাসীর ন্যায় কাজকর্ম্ম করিয়া ক্লান্ত হইয়া এই সামান্য জীর্ণ শয্যায় বিশ্রাম করিতেছেন। তুমি সতী, সাধ্বী স্বামীর প্রতি তোমার দৃঢ় অনুরাগ, শ্বশুর শাশুড়ির প্রতি অসীম ভক্তি তাহাতেই এত যন্ত্রণা পাইয়াও মনে কষ্ট অনুভব করনা।

দেবী। আপনি নিরর্থক আজ এত কথা বল্‌ছেন কেন? কৈ আমি তো সংসারে কোন কষ্টই পাই না। আমার ন্যায় স্বামী আদরে আদরিণী এইরূপ সুখী রমণী পৃথিবীতে কয় জন আছে। শ্বশুর আমার শিব তুল্য আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন; তবে শাশুড়ী

সময় সময় দুই এক কথা বলিয়া থাকেন; তা তিনি শাশুরী মাতৃ তুল্যা অন্যায় কাজ দেখিলে দুই এক কথা বলিতে পারেন; নিতান্ত বুদ্ধি-হীনা রমণীগণই তাহাতে দুঃখিতা হয়। যাহা হউক, আর ও সব কথায় প্রয়োজন নাই। আপনি কি কা'লই মহলে যাবেন?

যুবক। হাঁ অতি প্রত্যুষেই যেতে হবে।

দেবী। কাকার ছেলের ভাত হবার কথা ছিল, এখন হবে কি?

যুবক। হাঁ পরশ্ব তাহার ভাত হবে, বোধ হয় রমণ পুর হইতে কালই তোমাকে নিতে আসিবে।

দেবী। আপনি মহল থেকে কবে আসিবেন?

যুবক। বোধ হয় তিন চারি দিন বিলম্ব হবে।

দেবী। তবে আপনি খোকার ভাতের সময় উপস্থিত থাকবেন না।

যুবক। না।

দেবী। তবে কাকা এখন আপনাকে মহলে পাঠাচ্ছেন কেন?

যুবক। বিশেষ প্রয়োজন আছে। এখন ঘুম আসা যাউক রাত্র অধিক হইয়াছে।

দেবীবালা আর অধিক কোন কথা বলিল না। ক্রমে উভয়ে নিদ্রা দেবীর ক্রোড়ে বিশ্রাম লইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই।

চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ

রমণপুরের জমিদার গোবিন্দকুমার রায় চৌধুরী। গোবিন্দ রায় এক জন প্রগাঢ় বুদ্ধিমান লোক, তিনি বুদ্ধি কৌশলে পৈত্রিক

সম্পত্তি হইতে অনেক সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, কিন্তু কদাচও অধর্ম্ম করিয়া বা কাহাকে ঠকাইয়া এক কপর্দ্দক গ্রহণ করেন নাই। তিনি অধর্ম্মকে বড় ভয় করিতেন। বিদ্যা, বুদ্ধি, দয়া, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি গুণে ভূষিত হইয়া, গোবিন্দ রায় মহাশয় দেশের মধ্যে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়া ছিছেলন।

গোবিন্দ রায় মহাশয়েরা দুই ভাই ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠের নাম চন্দ্র রায়। এ দিকে গোবিন্দ রায় যেমন ধার্ম্মিক ও সর্ব্ব গুণ সম্পন্ন হইয়া লোকের চিত্ত বিনোদের কারণ ছিলেন; কিন্তু তেমন আবার তাহার কনিষ্ঠ নর-পিশাচ চন্দ্র রায়ের দুষ্কার্য্যে লোকের যন্ত্রণার পরিসীমা ছিল না।

চন্দ্র রায় লেখা পড়ায় মা সরস্বতীর বর-পুত্র, বিষয় কার্য্যের ও কোন ধার ধারিতেন না। তাহার কার্য্য ছিল দশটার সময় আহার করিয়া বয়স্য দিগের সহিত তাস, পাশা, দাবা ক্রীড়া এবং ছাগ ও মদের শ্রাদ্ধ করা। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া যদি গোবিন্দ রায় কিছু বলিতেন, তবে চন্দ্র রায় চক্ষু রক্ত বর্ণ করিয়া বলিয়া উঠিতেন "আমার পৈতৃক সম্পত্তি আমার যাহা ইচ্ছা তাহা করিব আপনার অসহ্য হয় আমার অর্দ্ধেক আমায় বণ্টন করিয়া দিউন"। ভ্রাতৃ বিচ্ছেদ সংসারে নিতান্তঅসুখের কারণ বিবেচনা করিয়া গোবিন্দ রায় আর তাহাকে অধিক কিছু বলিতেন না। কৌশলে উপদেশ দিতেন।

গোবিন্দ রায়ের একটি পুত্র ও একটি কন্যা; পুত্রের নাম সতীশচন্দ্র ও কন্যার নাম দেবী বালা। দেবীবালা বাল্য-কালাবধি সকলেরই বড় আদরিণীয়া ছিল। সতীশ কনিষ্ঠা ভগ্নী দেবীবালাকে এক দণ্ড না দেখিয়া থাকিতে পারিত না।

গোবিন্দ রায় সৎপাত্র ও কুলীন দেখিয়া গোপালপুরের বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র প্রবোধচন্দ্রের নিকট অষ্টম বৎসরের সময় দেবীবালাকে অর্পণ করিয়া গৌরী দানের ফল লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিষ্ণু চাটুয্যা নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন।

গোবিন্দ রায়ের এই একমাত্র আদরণীয়া বালিকা কন্যাকে এত অল্প বয়সে এরূপ দরিদ্রের ঘরে বিবাহ দেওয়াতে, গ্রামস্থ সকলেই তাহাকে তাহার এই কাজটী নিতান্ত নির্ব্বোধের ন্যায় হইয়াছে বলিয়া বলিতেন; কিন্তু গোবিন্দ রায় কেন যে, এইকাজ করিলেন তাহার গূঢ় তাৎপর্য্য কেহই অনুধাবন করিতে পারেন নাই। তাহার বুদ্ধি অসীম, এবং তিনি ভবিষ্যৎ বিবেচক ও সদাসৎ বোদ্ধা ছিলেন। তিনি বিবেচনা করিতেন ধনীর সন্তান বিদ্বান্ ও সৎস্বভাব-সম্পন্ন অতি বিরল। যাহার প্রতি মা লক্ষ্মীর কৃপা আছে, তাহার উপর মা সরস্বতী বিমুখ। গণ্ডমূর্খ পাষাণ্ড' অধার্ম্মিক ও কুলমর্য্যাদা হীন ধনীর পুত্র অপেক্ষা, সৎবংশজাত সৎস্বভাব-সম্পন্ন দরিদ্র-সন্তান শতগুণে শ্রেয়স্কর। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়াই, তিনি গোপালপুরের বিষ্ণুঠাকুরের পুত্র প্রবোধচন্দ্রের নিকট কন্যা দান করিয়াছিলেন। গ্রামস্থ লোকে তাহার আর একটী কর্ম্ম দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইতেন; তিনি সেই স্নেহের একমাত্র বালিকা কন্যা দেবীবালাকে বিবাহের পর আর বড় নিজ গৃহে রাখিতেন না, তিনি বলিতেন "কন্যাকে বিবাহের পর আর নিজগৃহে রাখতে নাই, তাহারা বাল্য কালে যদি স্বামীগৃহে থাকিয়া সংসারের সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া শিক্ষা না করে, তবে তাহাদের বিশেষ কষ্ট পাইতে হয়।" বালিকা দেবীবালা বাল-বুদ্ধি নিবন্ধন কখনও স্বামী গৃহে যেতে অনিচ্ছুক হইয়া রোদন করিলে, গোবিন্দ রায় বলিতেন "কেন

মা? তুমি কি সেই ভগবতী, সাবিত্রী, দময়ন্তী ও সীতা প্রভৃতি সতী রমণী গণের কথা ভুলিয়া গিয়াছ।” তিনি দেবীবালার চারি পাঁচ বৎসের কাল হইতেই সর্ব্বদা তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া গল্পচ্ছলে মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি পুরাণোক্ত সতী রমণীগণের কাহিনী বিবৃত করিয়া বুঝাইয়া দিতেন, আর শ্বশুর, শাশুরীও পতীর সেবা শুশ্রূষা করাই যে সতী রমণীর একমাত্র ধর্ম্ম এবং সর্ব্বদা স্বামী গৃহে থাকিয়া স্বামী গৃহের সমস্ত পরিজনকে আপন ভাবিয়া ভালবাসাই যে একমাত্র কর্ত্তব্য কাজ। সরলা বালিকা দেবীবালা পিতৃ উপদেশ সমস্ত হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া রাখিত। তবে বাল-বুদ্ধি নিবন্ধন কখনও যদি পতি-গৃহে গমন করিতে অনিচ্ছুক হইয়া রোদন করিত তখন গোবিন্দরায় ঐসমস্ত কথা পুনর্ব্বার উত্তেজনা করিয়া দিলে আর দেবী-বালা কোন আপত্তি করিত না, কর্ত্তব্য কাজ বিবেচনা করিয়া হৃষ্ট চিত্তে তথা হইতে স্বামী, গৃহে গমন করিত। এমন কি সময় সময় পিতৃ-গৃহ হইতে স্বামী গৃহে গমন করিবার জন্য পিতাকে অনুরোধ করিত, সে বলিত আমি অধিক দিন এখানে থাকিলে শ্বশুর শাশুরির বড় কষ্ট হয়। গোবিন্দরায় স্নেহময়ী বালিকা কন্যার মুখে এ সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া হর্ষোৎ ফুল্ল হৃদয়ে তাহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া আনন্দে বিভোর হইতেন। এদিকে দেবীবালা শ্বশুর গৃহে গেলে তাহার শ্বশুর বিষ্ণুঠাকুর বালিকা বধূর কার্য্য কলাপ দর্শন করিয়া নিতান্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন। তিনি মনে করিতেন। পুত্র-বধূ রূপে স্বয়ং লক্ষী আমারগৃহে আগমনকরিয়াছেন।

বিষ্ণুঠাকুর মহাশয় দুইবার দার পরিগ্রহ করিয়া ছিলেন। প্রথম পক্ষের স্ত্রী এক মাত্র পুত্র প্রবোধকে রাখিয়া মানব লীলা সম্বরণ করিলে পর গ্রামস্থ সকলেই তাহাকে পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহ করিতে

অনুরোধ করিতে লাগিল। তিনি "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" এই বাক্যের সার মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আর পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন, গ্রামস্থ সকল লোকের অনুরোধ ছাড়াইতে না পারিয়া বৃদ্ধ বয়সে তাহার পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করিতে হইয়াছিল।

বিষ্ণু চাটুয্যা যদিও নির্ধনী ছিলেন; কিন্তু তথাপিও গ্রামের মধ্যে তাহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল, গ্রামস্থ সকল লোকেই তাহাকে যথেষ্ট মান্য মাননা করিত। তিনি নিজেও নিতান্ত নিরীহ লোক ছিলেন এবং সর্ব্বদা ধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান ও সন্ধ্যা পূজায় রত থাকিতেন, অধর্ম্মে তাহার বড় ভয় ছিল; কখনও শূদ্রের দান গ্রহণ করিতেন না। যদিচ তিনি বর্ত্তমান সময়ের ন্যায়, তর্কতীর্থ, ন্যায়তীর্থ প্রভৃতি উপাধি ধারী পণ্ডিত ছিলেন না; কিন্তু তথাপিও তাহার পাণ্ডিত্য কম ছিল না; তিনি হিন্দুগৃহস্থের নিত্য প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা দিতে পারিতেন। গ্রামস্থ সকলেই তাহাকে বিষ্ণুঠাকুর বলিয়া ডাকিত। গ্রামের মধ্যে ব্রাহ্মণের সংখ্যা অল্প বিধায় ও তাহার সম্মানের অনেকটা কারণ ছিল।

বিষ্ণুঠাকুর দ্বিতীয়বার দার গ্রহণ করিয়া বড়ই অস্থির হইয়া উঠিলেন; নব-কামিনীর সম্ভোগে তাহার মনে কিছু মাত্র সুখ ছিল না। বৃদ্ধবয়সে দ্বিতীয়বার দার-গ্রহণ করিয়া অতি অল্প লোকেই সুখী হইয়া থাকে। বিষ্ণু ঠাকুরের অদৃষ্টেও তাহাই ঘটিয়াছিল। তিনি দরিদ্র ব্রাহ্মণ নব্যা-স্ত্রীর সমস্ত আব্দার রক্ষা করিতে পারিতেন না; তাহাকে যুবকের ন্যায় ভালবাসিতে জানিতেন না; সে তাহাকে ভাল বাসিবে কেন? তাহাদের দাম্পত্য প্রণয় হইবে কিরূপে? যাহা হউক, তাহাদের ভালবাসা থাকুক

আর নাই থাকুক; তাহার নব্যা স্ত্রী এখন তাহার ঘরের গৃহিণী। গৃহিণী কর্ত্তার কতকগুলি অন্যায় আচরণ দেখিয়া বড়ই বিরক্ত ছিলেন; বিষ্ণুঠাকুর সর্ব্বদা সন্ধ্যা পূজায় রত থাকিতেন, সাংসারিক অন্য কোন কাজ কর্ম্ম করিতেন না, অর্থ উপার্জ্জনেরও কোন বিশেষ চেষ্টা দেখিতেন না, গৃহিণীর গহনার জন্য উদ্যোগ ছিল না, আবার মধ্যে মধ্যে গৃহিণীকে পূজার সাজ করিয়া দিতে বলিয়া ত্যক্ত বিরক্ত করিতেন। এই সমস্ত কারণে বিষ্ণুঠাকুর গৃহিণীর চক্ষুশূল ছিলেন; এমন কি সময় সময় গৃহিণী রাগ করিয়া বলিতেন "কবে যে বুড়া যমের বাড়ী যাবে? কবে আমি সুস্থির হইব"? বিষ্ণু ঠাকুর এ সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়াও কর্ণে স্থান দিতেন না। তিনি হবিষ্য করিতেন, গৃহিণী অমঙ্গলের ভয়ে হবিষ্যপাক স্পর্শ করিতেন না, বিষ্ণু ঠাকুরের সন্ধ্যা পূজা সারিয়া পাক করিতে বড় কষ্ট হ'তো, তখন অনিচ্ছা সত্বেও পঞ্চদশ বর্ষীয় পুত্র প্রবোধচন্দ্রকে বিবাহ করাইয়াছিলেন।

তাহার দ্বিতীয় পক্ষের পরিণীতা স্ত্রী দেবীবালার প্রশংসা শ্রবণ করিলে মনে মনে দুঃখিতা হইতেন। দেবীবালা শাশুড়ীর মনস্তুষ্টির নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও এক দিন কি এক নিমিষের জন্য তাহার নিকট আদর পাইতেন না, ক্ষণ কালের নিমিত্ত ও অভাগিনী দেবীবালা শাশুড়ীর তীব্র কটু ভৎর্সনা ব্যতীত তাহার স্নেহবাক্য শ্রবণ করেন নাই, তিনি সর্ব্বদাই হাতনাড়া মুখনাড়া দিয়া, দেবীবালাকে তীব্র কটু বলিয়া গৃহিণীপনা জানাইতেন। ক্রমে দেবীবালা তাহার বিষ-নয়নে পড়িল; কিন্তু ইহাতেও দেবী-বালা এক দিনের জন্য তাহাকে অভক্তি বা অমান্য করে নাই। সে তাঁহার প্রতি মাতৃবতই ব্যবহার করিত।

চিরদিন কাহার সমান যায় না। এদিকে গোবিন্দ রায়ের সুখের সংসারে অশান্তি রূপ কীট প্রবেশ করিল। চন্দ্ররায় হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ হইয়া, আবার নানা প্রকারে গোবিন্দ রায়কে জ্বালাতন করিতে আরম্ভ করিল। গোবিন্দ রায় তাহার ঐরূপ আচরণ দর্শন করিয়া হৃদয়ে বড়ই আঘাত পাইলেন এবং মনেতেও নানাবিধ দুশ্চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইল সংসারের প্রতি দিনের দিন বিতৃষ্ণা জন্মিতে লাগিল, সংসারকে ঘোর নরকের আবাস বলিয়া মনে ধারণা হইল।

ইতি মধ্যে এক দিবস তাহার একমাত্র আদরের ধন জীবনের জীবন পুত্র সতীশচন্দ্রকে চন্দ্ররায়ের সহিত কোন দুষ্কার্য্যে প্রবৃত্ত দেখিয়া প্রাণে বড়ই আঘাত পাইলেন; হৃদয়ে নিদারুণ ক্রোধাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, বুদ্ধির বিপর্য্যয় ঘটিল, আর সহ্য করিতে পারিলেন না; সতীশকে তীব্র কটু ভৎর্সনায় ক্রোধের শান্তি করিতে লাগিলেন।

গোবিন্দরায় সতীশকে ঐরূপ কটু বলার পরদিবস হইতে সে নিরুদ্দেশ হইল। অনেক খোজ করিয়াও যখন তাহার আর কোন সংবাদ পাইলেন না, তখন গোবিন্দরায় তাহার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন এবং মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে তাহার কটু ভৎর্সনায় সতীশ অভিমানে আত্মহত্যা করিয়াছে। "যদি সতীশই এসংসারের মায়া পরিত্যাগ করিল, তবে আর আমার এ দুঃখময় সংসারে থাকিয়া কাজ কি? কাহার জন্য আর সংসার করিব, সতীশ যেখানে গিয়াছে আমি ও সে স্থানে যাই, আর যদি সতীশকে নিয়া গৃহে ফিরিতে পারি তবে সংসার করিব"। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে গোবিন্দরায় গৃহ পরিত্যাগ করিলেন।

ক্রমে একদিন দুইদিন করিয়া প্রায় একবৎসর গত হইল। গোবিন্দ রায় আর দেশে ফিরিলেন না। সতীশের ও কোন সন্ধান পাওয়া গেল না; কিছু দিন পর পতি-পুত্র-হীনা সতীশের জননী উন্মাদিনী বেশে কোথায় চলিয়া গেলেন, কে তাহার সংবাদ লেয়? এখন চন্দ্ররায় সংসারের একমাত্র কর্ত্তা। তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। সে সমস্ত বিষয়ের অধিকারী হইয়া আপন ইচ্ছা পূর্ব্বক ব্যয় বিধান করিয়া মনের হরিষে কাল কাটাইতেছে। এখন চন্দ্ররায়ের মেজাজ অন্য রূপ হইয়া গিয়াছে। মধুপোকার ন্যায় ভন্ ভন্ করিয়া নিয়তই বন্ধুর দল আসিতেছে। তাহাদের সহিত আমোদে মত্ত হইয়া প্রায়ই মদ ও ছাগলের ধ্বংস করিয়া অর্থের শ্রাদ্ধ করিতেন। এইরূপে অল্প দিন গত হইতে না হইতেই দেশ বিদেশে চন্দ্ররায় একজন বিখ্যাত ধনী নামে পরিগণিত হইলেন। তাহার ঐ রূপ ব্যয়বাহুল্য ও অপব্যয় দর্শন করিয়া যদি কোন আমলা, মুহুরী কি দেওয়ান্ জী কেহ কোনরূপ কথা বলিত তবেই তিনি রাগান্ধ হইয়া তাহাকে বরখাস্ত করিতেন। এইরূপে অল্প দিন মধ্যেই অনেক পুরাতন কর্ম্মচারী বরখাস্ত হইয়া সেই স্থলে নূতন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইল। এই পুরাতন কর্ম্মচারীর মধ্যে আমাদের প্রবোধও একজন; গোবিন্দরায় জামাতা প্রবোধের দুরবস্থা দর্শন করিয়া নিজ সংসারে তাহাকে একটি কাজ দিয়াছিলেন। আর জামাতাকে সর্ব্বদা নিকটে রাখাও তাহার একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। হায়! যে দেবীবালা গোবিন্দরায়ের এক মাত্র আদরণীয়া কন্যা ছিল, আজ কিনা সেই জামাই বিনা দোষে রায় সংসার হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন। সেই সময় প্রবোধ মনোদুঃখে অভিমানে চন্দ্ররায়ের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করিল, চন্দ্ররায় বুঝিতে পারিলেন

যে, তাহার এরাজ্য-ভোগে নিষ্কণ্টক হয় নাই। তাহার ভাতৃকন্যা দেবীবালাই এখন তাহার সুখ-রাজ্যে কণ্টক স্বরূপ, একণ্টক দূর করিতে না পারিলে হইবে না। "আমি চন্দ্ররায় আমার অসাধ্য কাজ নাই, একটা ছুরী বইতো নয় একদিন গলা টিপে মেরে ফেল্লেই সকল আপদ চুকে যাবে, তবে এখন প্রবোধের সহিত বিবাদে কাজ নাই, তাহার সহিত মৌখিক যথেষ্ট আত্মীয়তা রাখিতে হয়।" দুষ্ট চন্দ্ররায় মনে মনে এই সমস্ত দুরভিসন্ধি স্থির করিয়া প্রবোধকে নানা বিধ চাটুকার বাক্যে ভুলাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আবার চন্দ্ররায়ের সহিত সদ্ভাব সংস্থাপনের ইচ্ছা প্রবোধের না থাকিলে ও নানা কারণে পুনর্ব্বার তাহার সহিত সদ্ভাব করিয়া তাহার অধীনে কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন, কারণ অর্থাভাবে চন্দ্র রায়ের সহিত মোকদ্দমা চলিবেনা, বিশেষতঃ চন্দ্র-রায়ের কতক গুলি মনভুলান বাক্যে বিষ্ণুঠাকুর ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সরল প্রকৃতির বিষ্ণুঠাকুর চন্দ্ররায়কে সরল বলিয়াই মনে করি-তেন, চন্দ্ররায়ের দুরভিসন্ধি তাহার ন্যায় সরল প্রকৃতির লোকে বুঝিতে পারিবে কেন? চন্দ্ররায় বিষ্ণুঠাকুরকে বুঝাইয়া দিলেন যে, "এসমস্ত সম্পত্তিই প্রবোধের, সে কি আমার পর, তাহাকে এক কথা বলিলেই কি তাহার রাগ করা উচিত।" তাহার এই কথায় বিষ্ণুঠাকুর একেবারে গলিয়া গেলেন, আর তাহার উপর কোন রাগ রহিল না, প্রবোধকে বুঝাইয়া পুনর্ব্বার চন্দ্ররায়ের কাজ করিতে অনুরোধ করিলেন। প্রবোধ পিতৃ-অনুরোধে আবার তাহার কাজ করিতে লাগিল। সুচতুর, বুদ্ধিমান এবং কার্য্যক্ষম বলিয়া চন্দ্ররায় প্রবোধকে দিনের দিন স্নেহ করিতে লাগিলেন। এইরূপে চারি পাঁচ বৎসর চলিয়া গেল। ইতি মধ্যে চন্দ্ররায়ের এক

পুত্র জন্মিল। সেই অন্নারম্ভের পূর্ব্বেই প্রবোধকে চন্দ্ররায় মহলে পাঠাইয়া ছিলেন। পাঠক! আপনারা যে, পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে যুবক যুবতী দর্শন করিয়াছেন এখন তাহাদের পরিচয় পাইলেন কি? যুবক প্রবোধচন্দ্র আর যুবতী গোবিন্দ রায়ের আদরিণীয়া কন্যা দেবীবালা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বীরচাঁদ ঠাকুর।

পুণ্যাং পরোপকারঞ্চ পাপঞ্চ পরপীড়ণং।

গোবিন্দরায় পুত্র শোকে অধীর হইয়া পুত্রান্বেষণে বাহির হইলেন; বহু স্থানে বহুকাল পর্য্যন্ত তাহার অনুসন্ধান করিয়া যখন কোন সন্ধান পাইলেন না, তখন মনে মনে স্থির করিলেন যে, সতীশ নিশ্চয়ই কোন দস্যু কর্তৃক আক্রান্ত বা হিংস্রজন্তু কর্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে। "যদি প্রাণের সতীশই গেল তবে আর কি নিয়া সংসার করিব"? আর বহুদিন হইতেই গোবিন্দরায় সংসারের অসারতা বুঝিতে পারিয়া তাহার সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মিয়া ছিল। এজন্য গোবিন্দরায় আর বাটী ফিরিয়া যান নাই। এত সুখ ঐশ্বর্য্য সকলের মমতা ত্যাগ করিয়া সামান্য দরিদ্রের ন্যায়, উদাসীনের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সেই সময়ে চতুর্দ্দিকেই ভয়ানক দস্যু-ভীতি ছিল। সেই সময়েই গোবিন্দরায় সন্ন্যাসীর বেশে একাকী বনে বনে ঘুড়িয়া বেড়াইতেন, একদা তিনি কোন দস্যু-দল কর্তৃক ধৃত হইয়া দস্যুদল-পতির নিকট উপস্থিত হইলেন। দস্যু দল-পতি তাহার অবয়ব দর্শন ও তাহার কথা বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া

তাহাকে একজন সুচতুর লোক স্থির করিয়া নিজ দলভুক্ত করিয়া রাখিলেন। গোবিন্দরায় ও কোন কার্য্য উদ্ধারের উদ্দেশ্যে দস্যুকার্য্যে লিপ্ত হইয়া রহিলেন। অল্প দিন মধ্যেই তিনি দস্যু দল মধ্যে উচ্চাসন লাভ করিলেন। তাহার পরামর্শ মত দস্যুগণ কার্য্য করিয়া অল্প পরিশ্রমে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিল।

কিছু দিন পর দস্যুদল পতির মৃত্যু হইলে, সকলে পরামর্শ পূর্ব্বক গোবিন্দরায়কেই দস্যুদলপতি মনোনীত করিল। গোবিন্দ-রায় নিজ নাম পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক; "বীর চাঁদ ঠাকুর" নামে অভিহিত হইয়া দস্যুদিগের নেতা হইলেন। অল্পকাল মধ্যেই তাহার অলৌকিক কার্য্য কলাপ দর্শনে দস্যু সকল তাহার একান্ত বশী-ভূত হইয়া পড়িল। তাহার অনুমতি ব্যতীত কাহারই কোন কার্য্য করিবার অধিকার ছিলনা। তিনি যখন যাহাকে যে কার্য্যের জন্য অনুমতি করিবেন তৎক্ষণাৎ ভাল মন্দ বিবেচনা না করিয়া তাহা সম্পন্ন করিতে হইবে। এইরূপে প্রায় সহস্রাধিক দস্যুর অধিপতি হইয়া গোবিন্দরায় বনের মধ্যে রাজত্ব করিতে ছিলেন। ক্রমে তাহার গুণাগুণ শ্রবণ করিয়া, দিনের দিন দল বৃদ্ধিও হইতে-ছিল। পরোপকারই তাঁহার প্রধান দস্যু বৃত্তি ছিল। তাহার অধিনস্থ প্রত্যেক দস্যুকেই তিনি স্পষ্ট রূপে বুঝাইয়া ছিলেন "পুণ্যং পরোপকারঞ্চ পাপঞ্চ পরপীড়নং" তাহার অধীনস্থ দস্যুগণেরও ক্রমে ক্রমে এরূপ প্রকৃতি হইয়াছিল যে, তাহারা দস্যু নামে অভিহিত হইয়াও দেবতার ন্যায় কার্য্য কলাপ করিত। পরের দুঃখ দেখিলেই গলিয়া যাইত। সেই সময়ে রাজ্যে অরাজকতা ছিল। ইংরেজ রাজত্বের প্রথম সময়। রাজ্য শাসনের কোন রূপ সুবন্দোবস্ত হয় নাই। রাজকীয় কর্ম্মচারী নিজ স্বার্থসাধনের জন্য প্রজার উপর

বিশেষ অত্যাচার উপদ্রব করিত। সেই সমস্ত অত্যাচার নিবারণ করিবার চেষ্টা করিত বলিয়াই তখন বীরচাঁদ দস্যুদলের এতাদৃশ ভয়ঙ্কর নাম হইয়া ছিল যে, এই নাম শ্রবণ মাত্রেই সকলে কম্পিত হইত। কিন্তু বীরচাঁদ ঠাকুর, পুত্রের ন্যায় প্রজা পালন উদ্দেশ্যে এবং সাধারণের প্রতি অত্যাচার নিবারণের জন্যই দস্যু নামে অভিহিত হইয়া কলঙ্কের বোঝা মাথায় করিয়া ছিলেন। তিনি দস্যুদল পতি হইয়া দস্যুদিগের পূর্ব্ব উপার্জ্জিত বহুতর ধনের মালিক হইয়া ছিলেন। এখন সে সমস্ত অর্থ দ্বারাই সমস্ত সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। আর তাহার অধিনস্থ দস্যুগণ সকলেই ব্যাবসা বাণিজ্য প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। দস্যুবৃত্তি দ্বারা ধন উপার্জ্জন বীরচাঁদ দস্যুদলের ব্যাবসা ছিল না। পরমদয়ালু গোবিন্দরায় একমাত্র পরের দুঃখ নিবারণের জন্যই দস্যু নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। তিনি পরমযোগী। পরোপকার রূপ মহাব্রতই তাহার যোগসাধন ছিল। এই ব্রতে দীক্ষিত হই-য়াই তিনি নিজের অপার সুখ ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুত্র কন্যার মমতা বিস্মৃত হইয়া ঐরূপ দুর্নামের বোঝা মাথায় করিয়াও পরমানন্দে ছিলেন।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন ইংরেজ রাজত্বের প্রথমাবস্থা, লর্ডকর্ণওয়ালিস তখন গভর্ণরজেনারেল হইয়া আসিয়া-ছেন; হেষ্টিংসের প্রজার প্রতি অবিচার ও অত্যাচারে তখন রাজ্যের বড়ই বিশৃঙ্খল ভাব হইয়া ছিল। নিষ্ঠুর নির্দ্দয় রাজ কর্ম্ম চারিরা নিয়ত প্রজা পীড়ন করিয়া, প্রজাদিগকে মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা প্রদান পূর্ব্বক রাজস্ব আদায় করিয়া, নিজ উদর পূর্ণ করিত; কিন্তু রাজ-সরকারে খাজনা আদায় হয় না বলিয়া প্রকাশ করিত।

সেই সময়ে যে কত শত প্রজা পথের ভিখারী হইয়া, শোকে দুঃখে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আর পাপীষ্ঠ রাজ-কর্ম্মচারিদের দ্বারা কত শত নিঃসহায়া সুন্দরী সতী ললনার সতীত্ব অপহৃত হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। সেই সমস্ত পাপ চিত্রের দর্শন করিয়া দয়ালু গোবিন্দরায়ের প্রাণ কাঁদিয়া ছিল। তাই তিনি সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপবাদের বোঝা মাথায় করিয়া অরণ্য মধ্যে বীরচাঁদ নামে দস্যু-দলপতি হইয়াছিলেন। এইরূপে কিছুদিন গত হইলে যখন তিনি জানিতে পারিলেন যে, এরূপে প্রজার কষ্ট নিবারণ সহজ-সাধ্য নয়। রাজা ভিন্ন প্রজা পালনের কখনই সুশৃঙ্খল হইতে পারে না, অতএব রাজার ভার রাজাকে দেওয়াই কর্ত্তব্য। এই মনে করিয়া তিনি লর্ডকর্ণওয়ালিসের সহিত সময় সময় সাক্ষাৎ পূর্ব্বক রাজকীয় কার্য্যের মন্ত্রণা দিতেন। লর্ডকর্ণওয়ালিস্ অল্পদিন মধ্যেই তাহাকে বুদ্ধিমান ও সুচতুর স্থির করিয়া রাজকীয় কর্য্যের পরামর্শাদি গ্রহণ করিতেন। লর্ডকর্ণওয়ালিসের নিকট গোবিন্দরায় হরিদাস ভট্টাচার্য্য নামে পরিচিত ছিলেন। ইনিই যে সেই বীরচাঁদ দস্যু ইহা এক দিনের জন্যও মনে স্থান দিতে পারেন নাই। লর্ডকর্ণওয়ালিস্ ও মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে, এই সময়ে রাজ্যের সুশৃঙ্খলা সম্পাদনের জন্য এতদ্দেশীয় একটী সুচতুর লোকের প্রয়োজন। হরিদাস ভট্টাচার্য্যকেই তাহার উপযুক্তপাত্র বিবেচনায় তাহাকে নিয়ত নিকটে রাখিয়া পরামর্শাদি লইতে যত্ন করিতেন, হরিদাস সর্ব্বদা লর্ডকর্ণওয়ালিস্‌কে পরামর্শাদি দিতেন বটে, কিন্তু সর্ব্বদা নিকটে থাকিতেন না; মাঝে মাঝে তিনি যে কোথায় যাইতেন, কোথায় থাকিতেন, তাহার অনুসন্ধান পাইতেন না। তিনি যাহাই

কেন না করুণ, যথায়ই কেন না থাকুন, লর্ডকর্ণওয়ালিসের তিনি নিতান্ত প্রিয় পাত্র ছিলেন। হরিদাস ভট্টাচার্য্য ও নিস্বার্থ ভাবে অনেক রাজকীয় কার্য্যের পরামর্শ প্রদান করিয়া রাজ্যের অনেক সুশৃঙ্খলা করিয়া ছিলেন। দুঃষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিবার জন্য গোবিন্দরায়ের প্রাণপণ চেষ্টা ছিল। এই জন্যই তিনি ভয়ঙ্কর বীরচাঁদ দস্যুদলের, নেতা হইয়াছিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কু-চক্র।

যে রাত্রে প্রবোধ মেঘ মাথায় করিয়া মহলে যাইবার জন্য বাটী আসিয়াছিলেন। সেই রাত্রেই রমণপুরের জমিদার বাটীর একটী নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে বসিয়া, রাত্রী দ্বিপ্রহরের সময় তিনটী লোক নির্জ্জনে কোন গুপ্ত পরামর্শ করিতেছিল। তন্মধ্যে একজন চন্দ্ররায় আর দুটী তাহার ইয়ার হর প্রসাদ ও নবীনচাঁদ।

নবীনচাঁদ বলিল "আপনি উত্তম পরামর্শ স্থির করিয়াছেন এতে আর কোন গোলযোগই হইবার সম্ভব নাই। তবে কিনা আমাদের কল্‌সিস্‌টার উপর একটু বিশেষ নজর করিতে হইবে"।

চন্দ্ররায়। নিরুদ্বেগে কার্য্য নির্ব্বাহ হইলে তোমাদের দুইজনকে দুই হাজার টাকা বক্‌সিস্‌ দিব।

হরপ্রসাদ। তা টাকা পেলে আমাদের অসাধ্য কাজ নাই, বলুন না এখনি যেয়ে ছুরীটার গলা টীপে মেরে আসি।

চন্দ্র। না না এসব কাজ এত উতলায় হয় না, খুব সাবধান, যেন কাহার ও কোন রূপ সন্দেহ না হয়। এজন্যই এত চতুরতা পূর্ব্বক প্রবোধকে স্থানান্তরে পাঠাইয়া, এই সময়ে খোকার ভাতের আয়োজন করিলাম। কল্যই দেবীবালাকে আনিতে লোক পাঠান হইবে। আবার খোকার ভাতের পর দিনই কৌশলে পাঠাইয়া দিয়া রাস্তায় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে। চতুর্দ্দিকে যেরূপ দস্যু ভয়। লোকে নিশ্চয়ই মনে করিবে যে, দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে। আমার প্রতি কোন সন্দেহই থাকিবে না।

নবীন। তা আমি সব বুঝি; আপনার ন্যায় সুচতুর লোকের কার্য্য যে কেহ টের পাবে না তাহা জানি; কিন্তু আমাদের সহায়তা ভিন্ন কোন রূপেই কার্য্য নির্ব্বাহ হয় না, অতএব বক্‌সিসের বরাদ্দটা আর একটু বাড়াইয়া দিবেন।

একথায় চন্দ্ররায় হাসিতে হাঁসিতে বলিলেন "আচ্ছা তাই হবে হে তাই হবে। তোমাদের দ্বারাই আমার এসম্পত্তি ভোগ; তোমাদের অনুরোধ কি আমি অবহেলা করিতে পারি। আর জান এসমস্তই তোমাদের, আমি কি তোমাদের পর।'

নবীন। তাতো বটেই। আমরাই কি পর বিবেচনা করি। যদি তাই হবে তবে সেই সতীশ ছোড়ার প্রাণান্ত করিয়া গোবিন্দ রায়কেই বা কেন অকূল সাগরে ভাসাইয়া তাড়াইয়া দিলাম। আর অদ্যাপি সে চক্রান্তের বিষয় কি কেহ কিছু অবগত হইতে পারিয়াছে না জীবনান্তে কেহ টের পাবে।

চন্দ্র। ভাই তোমাদের গুণ আর শোধ করা যায় না, তোমাদের ন্যায় বিশ্বাসী কার্য্যক্ষম লোক ভিন্ন কখনই আমি একার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিতাম না। যাহা হউক যে কথা হচ্ছিল। তোমরা

সন্ধ্যার সময় দল বল নিয়া রাস্তার পাশে থাকিয়া, শিবিকা আক্রমণ পূর্ব্বক দেবীবালাকে নিবিড় বনে নিয়া কার্য্য শেষ করিবে; কিন্তু খুব সাবধান। আবার প্রালোভনে পড়িয়া মমতায় পড়িয়া ভুলিয়া যাইও না।

নবীন। আমাদের আবার মমতা যাহা হউক সে সমস্ত কিছু চিন্তা করিতে হইবে না। আমাদের বিষয় যেন ঠিক থাকে, তবে আমরা এখন আসি। এই বলিয়া নবীনচাঁদ ও হর প্রসাদ প্রস্থান করিল। চন্দ্ররায় পাপ চিন্তায় মগ্ন হইয়া একাকী বসিয়া রহিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দস্যু হইতে উদ্ধার।

আবার সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। তা হবে বৈ কি? প্রকৃতির রীতিই এই—সন্ধ্যার পর রজনী, রজনীর পর প্রভাত, প্রভাতের পর মধ্যাহ্ন; আবার মধ্যাহ্নের পর সন্ধ্যা হয়। সৃষ্টির আরম্ভ হইতে লয় পর্য্যন্ত কখনও এরীতির ব্যত্যয় হয় নাই, হইবেও না। বিশ্ব নিয়ন্তা যে কি আশ্চর্য্য নিয়মই সংস্থাপন করিয়াছেন; তাহা দর্শন করিয়া গাঢ় চিন্তা করিতে গেলে প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিকে ও পাগল হইতে হয়।

পৃথিবী শীতল হইয়াছে, এখন আর সে দিবাকরের প্রখর কর নাই। ক্রমে মৃদুল সন্ধ্যা সমীরণ নাচিয়া নাচিয়া বৃক্ষ শ্রেণীর উপর দিয়া বহিতে লাগিল, তাহাতে বৃক্ষের শাখা নড়িয়া সন্ সন্ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল; যেন নির্জ্জীব জড় বৃক্ষ সমূহ ও দিবসান্তে হস্ত পদ নাড়িয়া বিশ্ব স্রষ্টার গুণকীর্ত্তন করিতেছে। ক্রমে আঁধার

আলোকে সংগ্রাম উপস্থিত হইল। যখন ক্রমে দীপ্তির পরাজয় হইয়া অন্ধকার জয়ী হইয়া উঠিল, তখন মনো-দুঃখে আলোক বাইয়া বিদায় উন্মুখ আলোকরাজ সূর্যদেবের নিকট নালিস করিলেন। সূর্য্যদেব ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আলোকে বুঝাইয়া বলিলেন, "ইহার পরিশোধ প্রভাতে হইবে। নিয়ত কাহার জয় হয়না, আজ যাহার উন্নতি আবার কাল তাহার অবনতি এই পরিবর্ত্তন শীল জগতের নিয়মই এই।" ক্রমে সূর্য্যদেব অস্তমিত হইলেন। আলোকও তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রস্থান করিল। ক্রমে অনন্ত আধাঁর আসিয়া জগৎ অধিকার করিল। নীল নভঃস্থলে একে একে নক্ষত্র কুল প্রকাশ পাইতে লাগিল; তারকাগণে বেষ্টিত হইয়া সুধাকর সুধা কর প্রদান করিতে উদয় হইলেন। ক্রমে মধুর সন্ধ্যা অতীত হইয়া রাত্রি প্রায় চারি দণ্ড হইল।

শান্তিপুরের নিকট একটি বৃহৎ অরণ্য ছিল। তাহার পশ্চিম প্রান্ত দিয়া পুণ্যপ্রবাহিনী ভাগীরথী কুল কুল করিয়া গমন করিতে ছিলেন। অরণ্যের মধ্য প্রদেশ দিয়া একটি ক্ষুদ্র পথ ছিল। তখন সেই রাস্তায় দিবা ভাগেও কোনেও লোক চলা ফিরা করিতে সাহস করিত না; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, আজ এ নিশীথ সময়ে একাকী একটি ব্রাহ্মণ নির্ভয়ে সেই অরণ্য মধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন।

পাঠক আপনারা এ ব্রাহ্মণকে দেখিয়া কি মনে করিতেছেন, চলুন একবার উহার অন্তস্তত্ব জানিয়া মনের কৌতুহল নিবৃত্তি করিয়া আসি।

ব্রাহ্মণের বয়স আন্দাজ পঞ্চাশৎ বৎসর হইবে, দেখিতে গৌরবর্ণ—নাতি দীর্ঘ নাতি খর্ব্ব; দেহটি তেমন মোটা নয় আবার তত রোগা নয়, বস্তুতঃ ব্রাহ্মণ অতি সুপুরুষ। তাঁহার

গলদেশে রুদ্রাক্ষের মালা দুদুল্যমান; মস্তকের উপর এক হস্ত পরিমাণ শিক্ষা লম্বমান, দোষর একখানা নামাবলী, পরিধানে গেড়ুয়া বসন, ললাটে রক্তচন্দনের তিলক। এই সমস্ত সাত্বিক বেশে ব্রাহ্মণকে বড়ই সুন্দর দেখাইতে ছিল। তাঁহার শরীর হইতে ব্রহ্মণ্য-তেজ যেন ফাঁটিয়া বাহির হইতেছে। তিনি স্থির, ধীর, অথচ গম্ভীরভাবে অরণ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। এই নিবিড় হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ কান্তার প্রদেশে ব্রাহ্মণ রাত্রি কালে একাকী চলিতেছেন, অথচ তাঁহার হৃদয়ে কোন ভীতি ভাব নাই; বদন মণ্ডলে কোন বিষাদের চিহ্ন নাই। তিনি স্থির চিত্তে, নির্ভয় অন্তরে গমন করিতেছেন। অদূরে পুণ্য প্রবাহিনী পতিত উদ্ধারিণী জাহ্নবী নিজ অভিষ্ট সিদ্ধির কারণ গমন করিতেছেন। ভাগিরথীর অভিষ্ট কি? "পাপী উদ্ধার। ঐ দেখ তিনি দ্রুতবেগে গমন করিয়া পাপী খুজিয়া বেড়াইতে-ছেন। আর ফল্ কল্ শব্দে বলিতেছেন যে, "তোরা কে কোথায় পাপী আছিস আর একবার আমার বারি স্পর্শ করিয়া সমস্ত পাপ আমার জলে বিসর্জ্জন দিয়া যা।" পাঠক দেখুন জাহ্নবী নিস্বার্থে নিয়ত পাপী ডাকিয়া, পাপী খুজিয়া তাহার পাপ বিনাশ করিয়া, স্বর্গের পথ পরিস্কার করিয়া দিতেছেন; কিন্তু পতিত উদ্ধারিণী জাহ্নবী পাপী সংস্পর্শে কলঙ্কিনী হইতেছেন না, পাঠক তোমরাও যদি এইরূপ নিস্বার্থে পাপী ডাকিয়া তাহাকে পাপ-পথ হইতে ফিরাইতে পার তাহাতে তুমি পাপী হইবে না বরং তোমার অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় হইবে, চিরকাল অক্ষয় কীর্ত্তি-স্তম্ভ দেদীপ্যমান থাকিবে; কিন্তু আবার দেখুন স্বার্থে পাপীকে স্পর্শ করিলেও তাহার শাস্ত্র মতে পাপী হইতে হয়।

ব্রাহ্মণ ঐ নিবীড় অরণ্যের নিকটস্থ ভাগিরথী তীরে উপবেশন করিয়া নির্ভর অন্তরে স্থির-চিত্তে আপন ইষ্ট-মন্ত্র জপ করিতে আরম্ভ করিলেন। ইতিমধ্যে আকাশের পশ্চিম কোণে এক খানা ক্ষুদ্র মেঘ উঠিয়া গগণ আবৃত করিল। দেখিতে দেখিতে নক্ষত্র সমূহ সহ চন্দ্রদেব অদৃশ্য হইলেন। সমস্ত জগৎ অন্ধকারের সম্পূর্ণ অধিকার হইল; কোন স্থানে কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না। চন্দ্রালোকে ভূষিতা সেই রজনী এখন ঘোর তিমির-বসন পরিধান করিয়া বিকটভাবে দাঁড়াইলেন। এই আঁধার দেখিয়া ব্রাহ্মণ আবার উঠিয়া গঙ্গার ধারে ধারে আরও নিবীড় কান্তার প্রদেশে গমন করিতে লাগিলেন; তিনি কিছুদূর অগ্রসর হইলে হঠাৎ অদূরে কামিনী-কণ্ঠ-সুলভ রোদন ধ্বনি তাহার কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিল; হঠাৎ এই রজনী কালে অরণ্য মধ্যে স্ত্রী-কণ্ঠ-রোদন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ নিতান্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং অনতি বিলম্বে সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া দ্রুতবেগে কাননের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া তিনি যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার প্রাণ শিহরিয়া উঠিল, হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিল এবং ক্রোধে শরীর কাঁপিতে লাগিল, উঃ কি ভয়ানক দৃশ্য, কি অলৌকিক ব্যাপার, দুইটী বিকটাকার দস্যু একটী অপূর্ব্বা সুন্দরী নবীনা যুবতীকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে, যুবতী ভয়ে জড়সড় হইয়া ক্রন্দন করিতেছে। ব্রাহ্মণ এই পৈশাচিক কাণ্ড দর্শন করিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, দ্রুতবেগে একটী লম্ফ প্রদান করিয়া ঐ পাপীষ্ঠ দ্বয়ের নিকট অগ্রসর হইয়া বলিলেন দাঁড়া নরাধমেরা এখনই তোদের সমুচিত শাস্তি

প্রদান করিতেছি।" ব্রাহ্মণের বীরোচিত কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া পাপীষ্ঠেরা কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া দাড়াইল; তখন ব্রাহ্মণ পুনর্ব্বার দস্যুদিগকে বলিলেন "যদি জীবনের আশা থাকে তবে শীঘ্র এস্থান হইতে প্রস্থান কর; নতুবা এখনই তোদের প্রাণান্ত হইবে।" দস্যুদ্বয় তখন ভয়ে জড়সড় হইয়া দ্রুতবেগে ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। ব্রাহ্মণ যুবতীর নিকট গমন করিয়া তাহাকে সান্ত্বনাবাক্যে বলিলেন "মা এখন আর তোমার ভয় নাই। তুমি নির্ভয় চিত্তে আমার নিকট তোমার সমস্ত পরিচয় প্রদান কর, আমি তোমাকে যথাস্থানে রাখিয়া আসিব"। যুবতী তাহার বাক্যের কোন উত্তর দিতে পারিল না, কেবল ফেল্ ফেল্ করিয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল; আর দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রু-জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। যুবতীর চক্ষে জল দেখিয়া ব্রাহ্মণ সান্ত্বনা বাক্যে তাহাকে বলিলেন "মা আর কাঁদিওনা, আমি এখন আর তোমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া তোমার পূর্ব্ব শোকের উত্তেজনা করিতে ইচ্ছা করিনা, এখন চল এই রজনী আমার গৃহে অবস্থান করিবে, কাল প্রত্যূষেই তোমাকে বাড়ী পৌছাইয়া দিব। মা তুমি আমার নিকট ঠিক বল দেখি তুমি রঙ্গপুরের জমীদার গোবিন্দরায়ের কন্যা কি না?"

"আজ্ঞা হাঁ। আপনি কি ক'রে জানলেন যে, এই অভাগিনী সেই মহাত্মা গোবিন্দরায়ের কন্যা?"

"আমি তোমাকে অনেকবার দেখিয়াছি। তোমার শ্বশুর বিষ্ণু ঠাকুরের সহিত আমার বিশেষ পরিচয় আছে। থাক আজ আর সে সমস্ত কথা বলিয়া তোমার মনে কষ্ট প্রদান করিব না, আমার পরিচয় ক্রমে সবিশেষ জানিবে, এখন আমার সহিত গৃহে চল।

যুবতী আর কোন বাক্য প্রয়োগ না করিয়া ব্রাহ্মণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

পাঠক! আপনারা এ যুবতীকে চিনিলেন কি? এ আপনাদেরই সেই অভাগিনী দেবীবালা পর পরিচ্ছেদে সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আশ্রমে।

কিছুকাল পর উভয়ে আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। আশ্রমটী নিবীড় অরণ্যের মধ্যে। আশ্রমে দুইখানা খড়ের ঘর এবং একখানি ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ। গৃহ কয়খানা সমস্তই অতি ক্ষুদ্রায়তন বিশিষ্ট; কিন্তু অতি পরিষ্কার, অন্য লোকের কোন সারা শব্দ নাই। একখানি গৃহে লোল-জিহ্বা দিগম্বরা করাল বদনা এক কালীমূর্ত্তি স্থাপিত। ব্রাহ্মণ প্রথমেই সেই গৃহ সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া দেবী বালাকে বলিলেন,"মা এই গৃহে জগৎ আরাধ্যা জগদম্বা কালী আছেন, নমস্কার কর।"দেবী বালা মস্তক নত করিয়া নমস্কার করিলেন,ব্রাহ্মণ ও দরজা খুলিয়া অভয়ার স্তুতি করিয়া গদ গদ চিত্তে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন, দেবীবালা অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত প্রতিমার দিকে তাকাইয়া কর-যোড়ে বর ও অভয় প্রার্থনা করিলেন।

এইরূপে উভয়ে নমস্কার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আশ্রমস্থিত ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহে গমন করিলেন। গৃহের মধ্যে একটী সামান্য আলো জ্বলিতেছিল, দেবীবালা গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল গৃহে অন্য লোক

জন অধিক নাই. কেবল একপার্শ্বে একটী ষোড়শী রূপসী দীপা-লোকের প্রভাকে খর্ব্ব করিয়া স্বীয় জ্যোতিদ্বারা গৃহ আলোকিত করিতেছে। সেই রূপসী ব্রাহ্মণকে দর্শনমাত্র সসম্ভ্রমে ব্রাহ্মণের নিকট অগ্রসর হইল, ব্রাহ্মণ যুবতীকে বলিলেন "মা এই স্ত্রীলোকটী আজ এখানে থাকিবে যত্নের সহিত রাখিও"।

যুবতী। যে আজ্ঞা।—

দেবীবালা প্রথমতঃ মনে মনে চিন্তা করিতেছিল যে, ব্রাহ্মণ একাকী এইরূপ অরণ্য মধ্যে বাস করেন কেন? ইনি কি অরণ্য মধ্যে কোন সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না কোন অসৎ কার্য্যসাধন লোকালয়ে ব্যাঘাৎ হয় বলিয়া লোক নিন্দার ভয়ে এই নির্জ্জন স্থানে আসিয়া বাস করিতেছেন। গৃহ মধ্যে রূপবতী যুবতী দেখিয়া ব্রাহ্মণকে প্রথমে পাপ কর্ম্মের সাধক বলিয়াই বিবেচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু এখন ব্রাহ্মণের যুবতীর প্রতি বাৎসল্য জনক মা, ডাক শ্রবণ করিয়া বুঝিলেন, যুবতী ইহার পাপ কর্ম্মের সাধক নয়। ইহারা পরস্পর পিতা পুত্রী সম্বন্ধ।

ব্রাহ্মণ দেবীবালাকে বলিলেন,"মা আমি তবে এখন আসি,কাল সকালেই তোমাকে তোমার অভিপ্রেত স্থানে রাখিয়া আসিব। কোন ভয় নাই—নির্ভয় অন্তরে স্থিরচিত্তে এ স্থানে অবস্থান কর।

দেবী। পিতঃ! আমার জীবনদাতা পিতার নামটী পর্য্যন্তও কি জানিতে পারিব না।

ব্রাহ্মণ। আচ্ছা আমি একটু পরে আসিয়া তোমার সব বলিতেছি।

দেবীবালা ও যুবতী ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিল, তিনি প্রস্থান করিলেন।

ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলে দেবীবালা ও যুবতী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত

কথোপকথন করিলেন। প্রায় দুই ঘণ্টা পর ব্রাহ্মণ পুনর্ব্বার উপস্থিত হইয়া দেবীবালাকে বলিলেন, "মা দেবীবালা! তোমার পিতৃব্য চন্দ্ররায় তোমাকে ভালবাসেন কেমন?"

"কেন, একথা কেন? যথেষ্ট।"

"প্রয়োজন আছে। কতকাল পর খুড়ার বাড়ী গিয়াছিলে?

"প্রায় ছয়মাস পর।

"তোমার পিতার সম্পত্তি এখন কে ভোগ করে।"

"পিতার সম্পত্তি কি? তিনি বহুকাল যাবৎ নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। তিনি নিরুদ্দেশ হওয়ার পর খুড়াই সংসারের একমাত্র কর্ত্তা।"

"প্রবোধকে তোমার খুড়া কত মাহিনা দেন।"

"আমি ঠিক জানি না।"

"প্রবোধ কি এখন বাড়ী আছে।"

"না।"

"কোথায়"

"তিনি খুড়ার সংসারে কাজ করেন কোন বিশেষ কাজের জন্য খুড়া তাঁহাকে মহলে পাঠাইয়াছেন, তাহাতেই তিনি আজ চারি দিবস যাবৎ মহলে গিয়াছেন।"

"সে কত দিন পর বাড়ী আসিবে।"

"শীঘ্রই বাড়ী আসিবেন বলিয়া গিয়াছেন।"

"আচ্ছা এখন কি তুমি আমার পরিচয় শুনিতে ইচ্ছা কর।"

"যদি অনুগ্রহ করিয়া বলেন তবে বড়ই সুখী হই।"

"আমার নাম শুনিলে তুমি ভয় পাইবে। আমার নাম "বীরচাঁদ ঠাকুর" দস্যু দলের সরদার।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

শ্বশুর ও পুত্রবধূ।

রজনী প্রভাত হইল। রজনীর অবসানে উষাদেবী সুবেশা হইয়া আগমন করিলেন, কাক, কোকিল প্রভৃতি পাখী সমূহ আপন২ কুলায় থাকিয়া কল্ কল্ রবে প্রভাতের আগমন বার্ত্তা জগতে ঘোষণা করিল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ "প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং" প্রভৃতি মন্ত্রপাঠ করণান্তর গাত্রোত্থান করিলেন; একে একে দুইয়ে দুইয়ে জগতের সমস্ত জীবই জাগ্রত হইতে লাগিল; পাখি-কুল কুলায় পরিত্যাগ করিয়া আহার অন্বেষণে গমন করিল। ক্রমে পূরব গগণে রক্তিমবর্ণ দিবাকর দিবা করিবার নিমিত্ত জগতে প্রকাশিত হইলেন; সরোবরে কমলিনী ঈষৎ হাসিয়া উঠিল; কুমুদিনী অধো-বদনা হইল, কুলবধূ ঘোমটা টানিল, দাস দাসী কাজ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল, পসারী দোকান খুলিল, এইরূপে দেখিতে দেখিতে নির্জীব জগৎ যেন পুনর্ব্বার সজীব হইয়া উঠিলেন।

গোপালপুরের বিষ্ণুঠাকুর অতি প্রত্যুষে উঠিয়া প্রাতঃস্নান ও সন্ধ্যাদি করিয়া বাটীতে ফিরিয়াছেন। এইরূপ প্রতিদিনই তিনি প্রত্যুষে গঙ্গাস্নান ও সন্ধ্যাদি করিয়া থাকেন; কিন্তু আজ কিছু তাড়াতাড়ি; কারণ, আজ তাহার নিজ হস্তে পূজার সমস্ত ঠিক ঠাক করিয়া লইতে হইবে। প্রায় তিন চারি দিবস যাবৎ তাহার পুত্রবধূ দেবীবালা গৃহে নাই। সে তাহার পিতৃব্য-পুত্রের অন্নারম্ভে পিতৃব্যালয়ে গমন করিয়াছে। এখন আর কে তাহাকে মনোমত করিয়া পূজার সাজ করিয়া দিবে? গৃহলক্ষ্মী পুত্রবধূ গৃহে না

থাকিলে যেন তাঁহার নিকট গৃহ আঁধার বলিয়া বোধ হয়, তাঁহার মন আজ বড়ই অস্থির; পুত্রবধূটীকে এখনও দিয়ে গেল না বলে বৈবাহিক চন্দ্ররায়ের উপর অত্যন্ত রাগ হইলেন; তিনি গৃহে বসিয়া পূজার সাজ করিতে করিতে এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে বেলা প্রায় চারিদণ্ড হইল। এখনও বিষ্ণু ঠাকুরের স্ত্রী মনের সুখে নিদ্রা যাইতেছেন। জানালা দ্বারা প্রভাতিক বায়ু প্রবেশ করিয়া তাহার সহায়তা করিতেছে।—

বিষ্ণুঠাকুর স্তবকবচ পড়িতে পড়িতে পূজার সাজ করিতেছেন, এমন সময় বৈবাহিক বাড়ীর একটি লোক আসিয়া তাহার নিকট একখানা পত্র দিয়া গেল, তিনি সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া আগ্রহের সহিত বৈবাহিকের পত্র পড়িতে লাগিলেন—

পরম আত্মীয়বরেষু!

"আজ আপনাকে পত্র লিখিতে হস্ত কম্পিত হয়; শোকানল প্রবল বেগে ধপ্ ধপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। গত কল্য অপরাহ্নে শিবিকারোহণে দেবীবালাকে গোপালপুর প্রেরণ করা হইয়াছিল। দৈব-বিড়ম্বনায় পথিমধ্যে তাহারা দস্যুদল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। আমার লোক জন দুই একটি ফিরিয়া আসিয়াছে; কিন্তু বহু অনুসন্ধানেও দেবীবালাকে পাইতেছি না। যাহা হউক আপনি শোক করিবেন না—সকলই ঈশ্বর ইচ্ছা—আপনার ন্যায় জ্ঞানীজনে এ বিষয়ে অধিক লেখা বাহুল্য মাত্র ইতি ১০ই বৈশাখ।

নিঃ—

শ্রীচন্দ্রকুমার দেবশর্ম্মা।

বিষ্ণুঠাকুর পত্র পড়িতে পড়িতে, বালকের ন্যায় হায়! হায়! করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, দুই গণ্ড বহিয়া চক্ষু-জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল, তিনি ক্ষণকালের জন্য যেন জ্ঞান-হারা হইলেন; তাঁহার জিহ্বা আড়ষ্ট হইয়া উঠিল। মুখ দিয়া আর বাক্য বাহির হয় না, নীরবে চতুর্দ্দিক দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তিনি ক্ষণ-কাল পর শোকে দুঃখে অস্থির হইয়া চিৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

যে বিষ্ণুঠাকুর ক্ষণকালের নিমিত্ত পুত্রবধূকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না, আজ জন্মেরমত তাঁহাকে হারাইলেন, তাহার আদরণীয়া স্নেহের স্বর্ণলতা পুত্রবধূ আজ দস্যু কর্ত্তৃক অপহৃতা একথা ভাবিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

ক্রমে গোলযোগ শুনিয়া পাড়ার লোক একে একে বিষ্ণুঠাকু-রের বাড়ী জমা হইতে লাগিল। প্রাচীনগণ নানাবিধ বাক্যে তাহাকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। কেহ বা বধূটীর গুণের কথা উল্লেখ করিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন; এইরূপে প্রত্যেকেই একটী না একটী কথা বলিয়া আত্মীয়তার পরিচয় প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে বেলা প্রায় এক প্রহর অতীত হইয়া গেল; রৌদ্রের উত্তাপ প্রখর হইয়া উঠিল।

এমন সময় ছয়জন বেহারা একখানা শিবিকাস্কন্ধে বিষ্ণু ঠাকুরের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। বেহারাদের অগ্রে অগ্রে একটী অপরিচিত লোক একখানি পত্র হস্তে করিয়া আসিয়াছে; সে একটী লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিল; "মহাশয় এই কি বিষ্ণুঠাকুরের বাড়ী"।

"হাঁ! তোমরা কোথা হইতে আসিয়াছ" পত্রবাহক লোকটি

আর কোন কথা না বলিয়া বেহারাদিগকে ইঙ্গিতে শিবিকা রাখিতে বলিয়া একখানি পত্র বিষ্ণুঠাকুরের হস্তে প্রদান করিল; উপস্থিত লোক সমূহ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া চাহিয়া রহিল; ক্রমে শিবিকার মধ্য হইতে এক অপূর্ব্বা সুন্দরা রমণীমূর্ত্তি নানাবিধ অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া বাহির হইল; সকলে দর্শন করিয়া অবাক্, কেহ কেহ প্রফুল্ল হৃদয়ে বিষ্ণুঠাকুরকে বলিল "কি মহাশয় আপনার বৈবাহিক কি লিখিয়াছেন? এ সমস্ত কাণ্ডের তো আমরা আভ্যন্তরিক ভাব কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

সরল প্রকৃতির বিষ্ণুঠাকুর কোন বাক্য ব্যয় না করিয়া সর্ব্বজন সমক্ষে পত্রখানা পড়িতে লাগিলেন,

আত্মীয়বরেষু।—

মহাশয়! আমি আপনার নিকট অপরিচিত নহি—আপনার সহিত আমার একটী বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও আছে, তাহা ক্রমে আপনি জানিতে পারিবেন; এখন আপনার পুত্রবধূ দেবীবালাকে কল্য রজনীতে দস্যু হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া আপনার নিকট পাঠাইলাম কোন সন্দেহ করিবেন না।

নিঃ—

শ্রীহরিদাস দেব শর্ম্মা।

এই পত্র শ্রবণ করিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উঠিলেন; অনেকেই নানাকথা তুলিয়া কান কানি করিতে লাগিলেন; একজন বলিলেন "মহাশয় হরিদাস দেবশর্ম্মা লোকটী কে? অপর একজন বৃদ্ধ উত্তর করিলেন "চিনিতে পারিলেন না, সেই পাপীষ্ঠ হরিদাস ভট্টাচার্য্য যাহার সহিত ইংরাজ রাজের বড় আত্মীয়তা; যিনি সে

দিন রমানাথপুরের হরিমুন্সিকে কার্য্য হইতে বরখাস্ত করিয়াছেন, আহা! হরিমুন্সি এক জন ধার্ম্মিক লোক, ইংরাজ সরকারে কাজ করিয়া বেশ দশটাকা উপার্জ্জন করিত, নিরপরাধে তাহাকে পথের ভিখারী করলে"। আর একটী লোক বলিল "না না সে কেন হইবে? তার কি দয়া মায়া আছে"।

বৃদ্ধ। তুমি দয়ার কাজ কি দেখিলে বাপু! একটি ভদ্র গ্রহস্থের কুলবধুর সর্ব্বস্ব ধন সতীত্ব নষ্ট করিয়া এখন রাজার ভয়ে এই কৌশল করিয়া বউটীকে পাঠাইয়াছে। যে চন্দ্ররায় নইলে ওর মাথাটি ছিড়িয়া ফেলিত। এ আরতো সেই দিনে সোনার নিঃসহায়া মেয়ে নয়।

"দিনে সোনার মে'য়ের কি করেছিল"?

বৃদ্ধ। হাকে তুমি দেখছি নিতান্ত বালক এর কি কিছুই শোন নাই, বাপুহে চতুর্দ্দিকে কাণ রাখিতে হয়। হরিমুন্সির কাজ যাওযার কারণ ও 'সেই দিনে সোনার মেয়ে। মেয়েটী অন্নাভাবে মারা যায় দেখিয়া হরিমুন্সি মেয়েটাকে নিজ-গৃহে আনিয়া রাখে; কি প্রকারে সেই মেয়েটী এক দিন ঐ বামুনের নজরে পড়ে; অমনি ঐ দুষ্ট বামুন লোক জন আনিয়া মেয়েটীকে বলপূর্ব্বক লইয়া যায় এবং ইংরাজ রাজের নিকট তাহার নানারূপ মিথ্যাপবাদ করিয়া তাহাকে কার্য্য হইতে বরখাস্ত করিয়া দেয়। ঐ ব্রাহ্মণ এখন পর্য্যন্ত সেই মেয়েটিকে নিজের গৃহে রাখিয়াছে। বামুন নাকি সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখিলেই তার এইরূপে সর্ব্বনাশ করে।

ইহার মধ্য হইতে আর একটি লোক আস্তে আস্তে বৃদ্ধের নিকট বলিল "মহাশয় শুনিয়াছি এই হরিদাস ভট্টাচার্য্যই নাকি, বিরচাঁদ দস্যুদলের সরদার"।

বৃদ্ধ। কে জানে বাপু! তাহা হ'লেইবা আমরা তাহার কি করিব? ইংরাজরাজের সহিত তাহার যেরূপ প্রণয়, তাহাকে কেহ দস্যু বলিলে তৎক্ষণাৎ শূলে যে'তে হবে।

নিরীহ, পরোপকারী, সৎস্বভাব বিশিষ্ট হরিদাস ভট্টাচার্য্যের এইরূপ নিন্দাবাদ শুনিয়া বিষ্ণুঠাকুর মনে মনে নিতান্ত দুঃখিত হইলেন। তিনি জানিতেন হরিদাস ভট্টাচার্য্য যে সকল কার্য্য করিয়াছেন তাহার একটিও অন্যায় হয় নাই। প্রথমতঃ তিনি চেষ্টা করিয়া হরিমুন্সিকে কাজ হইতে বরখাস্ত করিয়াছেন। হরিমুন্সী নিতান্ত নিষ্ঠুর ও প্রজা পীড়ক, প্রজাদিগকে অশেষ যন্ত্রণা প্রদান করিয়া কর আদায় করিত এবং নিজের উদর পূর্ণ করিয়া রাজার নিকট বলিত "প্রজারা কর দিতে চাহেনা।" রাজস্বের আয় কম অথচ প্রজারা ঘর বাড়ী বিক্রয় করিয়াও কর দিয়াছে। হরিমুন্সী নিতান্ত অধর্ম্মাচারী, কামুক এবং কাজের অনুপযুক্ত, তাহার হৃদয় পাষাণ তুল্য, দয়া মায়ার লেশ মাত্র নাই। আহা! পাপীষ্ঠ সেদিন দিনেসোনার নিঃসহায়া কন্যাটিকে নিজ কুপ্রবৃত্তি সাধন করিবার জন্য বল পূর্ব্বক নিয়া যায়; দয়ালু হরিদাস জানিতে পারিয়া, কন্যাটিকে দুষ্টের নিকট হইতে নিয়ে এখন পর্য্যন্ত নিজের নিকট রাখিয়া কন্যা নির্ব্বিশেষে পালন করিতেছেন। হরিমুন্সীর ন্যায় পাপীষ্ঠের কাজ যাওয়াতে প্রজার যে কত উপকার হইয়াছে বলা যায় না। যদি কোন দুষ্ট লোক দুষ্ট অভিসন্ধির নিমিত্ত, কোন কুল-স্ত্রীকে অপহরণ করে তবে তিনি প্রাণপণে তাহার উদ্ধার সাধন করেন। শিষ্ট লোকের উপকার এবং দুষ্টের শাসন করাই তাহার প্রধান কর্ত্তব্য। তিনি একজন দেবতুল্য লোক, তাহার সৎব্যবহারে ইংরাজ রাজের নিকট তিনি বড়ই সম্মানিত হইয়াছিলেন।

হরিদাস ভট্টাচার্য্যের সমস্ত গুণের কথা জ্ঞাত ছিলেন বিধায়ই বিষ্ণুঠাকুর আজ তাহার নিন্দা শ্রবণ করিয়া দুঃখিত অন্তঃকরণে বলিলেন; "আপনারা যদি তাঁহার আভ্যন্তরিক সমস্ত বিবরণ জানিতেন তাহা হইলে কিছুতেই তাহার নিন্দা করিতেন না। এই কথা শুনিয়া পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধ বলিল। "হাঁ ঠাকুর বুঝিয়াছি; তুমি তাহার নিন্দা করিলে তোমার বউকে ঘরে নিবে কিরূপে? আর আমরা কিছু বলিতে চাহি না, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহা কর, আমরা বাড়ী চল্লেম" এই বলিয়া বৃদ্ধ প্রস্থান করিল, একে একে সকল লোকই বিষ্ণুঠাকুরের বাড়ী হইতে চলিয়া গেল। তখন একাকি বিষ্ণুঠাকুর বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন; এখন কি করি, বধুকে গৃহে রাখিলে গ্রামস্থ সমস্ত লোকেই আমাকে সমাজে বদ্ধ করিবে; আর আমার স্নেহের প্রতিমা লক্ষীরূপা সরলা, পুত্রবধূটীকেই বা কোন প্রাণে বিসর্জ্জন দেই। এ বিপদে আমাকে সৎপরামর্শ প্রদান করেন এমনও কেহ নাই। যাহা হউক বৈবাহিক চন্দ্ররায়ই আমার একমাত্র অবলম্বনের স্থান, তাহাকে এসব বিষয় জানাইলে, তিনি যাহা পরামর্শ করেন তাহাই করিব।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

গিরিবালা।

বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। প্রচণ্ড প্রভাকরের প্রখর করে পৃথিবী যেন দগ্ধ হইতেছে। পথস্থিত বালুকারাশী অগ্নিকণা সদৃশ উত্তপ্ত হইয়াছে। হাটে, মাঠে, রাস্তায় একটি জনপ্রাণীও চলাফিরা করিতেছে না। এখন আর সেই প্রভাতের শীতল মলয় পবন আসিয়া প্রাণীগণের আনন্দ বর্দ্ধন করেন না; বোধ হয় প্রখর রবি-কিরণকে অনিলদেবও ভয় করিতেছেন; তাহাতেই এখন চলাফিরা না করিয়া কোথায় বিশ্রাম করিতেছেন; না না বিশ্রাম করিবেন কেন? জগৎপ্রাণ বিশ্রাম করিলে জগতের প্রাণ থাকিবে কিসে? ঐ দেখুন ক্লান্ত ঘর্ম্মাক্ত কলেবর পথিক বিশ্রামার্থ বটবৃক্ষ নীচে উপবেশন করিয়াছেন; পবনদেব নিস্বার্থভাবে তাহার ভৃত্যের কাজ করিতেছেন; জগতের জীব দেখ? পবনদেব জগতের সমুদায়কে ইহাই শিক্ষা দিতেছেন যে, বিপন্ন ক্লান্ত পথিকের দুঃখ দূর করিতে মহৎ ব্যক্তিও ভৃত্যের ন্যায় তাহার কাজ করিবে। বৃক্ষ সমূহ নিশ্চল স্থির ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছে, বোধ হইতেছে যে, যদি তাহারা জড়পদার্থ না হইত, যদি তাহাদের চলৎশক্তি থাকিত, তাহা হইলে অবশ্যই এই অসহ্য রবিকরে দগ্ধিভূত না হইয়া কোথায় অবস্থান করিয়া বিশ্রাম করিত। সরোবরে বিষাদিনী কুমুদিনী অধোবদনে অবগুণ্ঠনবতী হইয়া মাতার কোলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। আবার ঐ দেখুন কমলিনী আপন

বক্ষঃ বিস্তার করিয়া পতির পরাক্রম দর্শনে খল খল করিয়া হাসিতেছে। ভাস্করদেব এইরূপে জগৎকে দগ্ধ করিতেছেন; কিন্তু দুর্ভাগিনী দেবীবালা এখনও বাহিরে বসিয়া প্রচণ্ড রবির প্রখর উত্তাপ উপভোগ করিতেছে; ইহাতে তাহার ভ্রূক্ষেপও নাই, সে একমনে কেবল চিন্তা করিতেছে। তবে কি কোমলাঙ্গিনী সরলাবালা দেবীবালার কোমলাঙ্গে সূর্য্যদেব প্রখর কর বর্ষণ করিতেছেন না; তা হইতে পারে কোমল বস্তুতে তাঁর দয়া আছে; তিনি কোমলে কঠিন ব্যবহার করেন না, তাহাতেই সরোবরে কোমলাঙ্গিনী কমলিনীর উপর প্রখর কর বর্ষণ না করিয়া সুধা বর্ষণ করিয়া থাকেন। এ দুঃখিনী দেবীবালাও একটি পদ্মিনীর তুল্যা, বোধ হয় পদ্মিনী ভাবে ইহার উপরও সুধা বর্ষণ করিতেছেন। নতুবা দুঃখিনীর দুঃখ দেখিয়া দয়া করিয়া সুধা বিতরণ করিতেছেন। না না তা হইতে পারে না; সেই বিশ্ব নিয়ন্তার নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারে না। সূর্য্যদেব জগতের সর্ব্বস্থানেই একভাবে করবর্ষণ করেন; তবে সূর্য্যের তাপে কেহ হাসে, কেহ দুঃখিত হয়, এই দেখুন সরোবরে কমলিনী হাসিতেছে, কুমুদিনী কাঁদিতেছে, আবার কৃষক একমনে ক্ষেত্র-কর্ষণ করিতেছে তাহার সূর্য্য উত্তাপ লক্ষ্য নাই। আজ কৃষকের ন্যায় দেবীবালাও আপন ইষ্টানিষ্টের চিন্তায় মনোনিবেশ করিয়া সূর্য্যের প্রখর তাপ লক্ষ্য করিতেছে না। তাহার হৃদয়ে দুশ্চিন্তারূপ সূর্য্য উদয় হয়ে এত তাপ প্রদান করিতেছেন যে জগৎ দগ্ধকারী গগণস্থ সূর্য্যের তাপ তাহার নিকট পরাস্ত হইয়াছেন। প্রবল জলন্ত অগ্নিতে যাহার শরীর দগ্ধ করিতেছে; সামান্য জলন্ত অঙ্গারে

তাহার লক্ষ্য হইবে কিরূপে। দেবীবালা সেই প্রখর রৌদ্রের মধ্যে বসিয়া আপন দুরাদৃষ্টের বিষয় চিন্তা করিতেছে। মধ্যে২ দুইগণ্ড বহিয়া দুই এক বিন্দু চক্ষের জল গড়াইয়া পড়িতেছে; রবির প্রখর করে কোমলাঙ্গিনীর কোমলাঙ্গ হইতে স্বেদ নির্গত হইতেছে। অশ্রুজল দুগণ্ড বহিয়া সেই ঘর্ম্মের সহিত মিশ্রিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিতেছে।

এমন সময় বিষ্ণু ঠাকুর অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে করিতে দেবী বালার নিকট আসিয়া বলিলেন "মা আমি বড় বিপদগ্রস্ত হইয়াছি; হায় এমন স্বর্ণলতাকে কি না আজ জন্মের মত অকূল সাগরে ভাসাইব। আজ এই রত্ন সদৃশা সরলাবালা পুত্রবধুকে সমাজের ভয়ে পরিত্যাগ করিব, না না আমি তা পারিব না; সমাজ আমাকে বন্ধ করে করুক, আমি এক ঘরে হই হইব, ইহাতে আমার বাড়ী কেহ না আসে না আসুক; কিন্তু আমি এই রত্ন সদৃশা সাধ্বিবালা পুত্রবধুকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। হায় এ জমীদার গোবিন্দ রায়ের স্নেহের কন্যা এখন এ পৃথিবীতে আমরা ভিন্ন ইহার কেহই নাই; আমরা আশ্রয়-দাতা হয়ে এখন ইহার সর্ব্বনাশ করিব। বিষ্ণু ঠাকুর এই কথা বলিতে২ ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন; দেবীবালা বুঝিল তাহার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। শ্বশুর তাহাকে সমাজের ভয়ে পরিত্যাগ করিবে; ইহা ভাবিয়া অনর্গল ধারায় অধোবদনে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল; নিস্বহায়া অবলাবালার আর সম্বল কি? নয়ন জলই একমাত্র সম্বল।

বিষ্ণু ঠাকুর আবার বলিলেন "মা এ বিপদে আমাকে সৎপরামর্শ দেয় আর এমন কেহই নাই। গ্রামস্থ সকলেই তোমাকে পরিত্যাগ

করিতে বলিতেছেন। আমি আত্মীয় বিবেচনায় তোমার পিতৃব্য চন্দ্ররায় মহাশয়কে পত্র লিখিলাম তিনিও প্রকারান্তরে এইরূপ মত প্রকাশ করিলেন, এখন কি করি? আমি কোন প্রাণে তোমাকে বিসর্জ্জন দিই।”

দেবীবালা এখন বুঝিলেন যে তাহার শ্বশুর তাহাকে সমাজের ভয়ে গৃহে রাখিতে পারিতেছেন না; তাহার পিতৃব্যও তাহায় গৃহে রাখিতে শ্বশুরকে নিষেধ করিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া তাহার মস্তকে যেন বজ্রপাত হইল; সে সম্মুখে এই মহাসাগর দেখিয়া বড়ই অস্থির হইল; তাহার প্রাণের ভিতর দূর্ দূর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, মুখ দিয়া আর বাক্য নির্গত হইল না; কেবল অধোবদনে নিরবে ক্রন্দন করিতে লাগিল।

এমন সময় হন্ হন্ করিয়া অলঙ্কারে ঝনাৎ ঝনাৎ শব্দ করিতে করিতে গৃহিনী আসিয়া হাতনাড়া মুখনাড়া দিয়া দেবীবালাকে বলিলেন, “বলি আর এখানে বসিয়া কাঁদিলে কি হইবে? আমরা আরতো সমাজে বদ্ধ হয়ে তোমাকে ঘরে রাখিতে পারিব না, এখন তুমি তোমার পথ দেখ, তোমার জন্য কি আমরা সকলে মারা যাব, তোমার কাকা পর্য্যন্তও তোমাকে গৃহে রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন।”

দেবী। আমি কোথায় যাইব, আমার যে আর ত্রিভুবনে দাঁড়াইবার স্থান নাই।

গৃহিনী। কোথায় যাইবে তা আমরা কি জানি। যমের বাড়ী যাও নতুবা তোমার এ কলঙ্ক দূর হইবে না।

দেবী। কাজেই আপনারা আমার আশ্রয় তরু, আশ্রয় তরু হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে লতা কি জীবিত থাকে, আমি

মরিতে চলিলাম; একদিন আমি যেখানে যাই সেখানে আপনাদেরও যাইতে হইবে। সেই স্থানে যেন অধিনীকে পুত্রবধু বলিয়া স্নেহ করেন।” গৃহিনী দেবীবালার এই কথা শুনিয়া রাগিয়া বলিলেন, “কি নচ্ছার বেটী যতদূর মুখ ততদূর কথা, তুই নিজে অধঃপাতে গিয়েছিস বলে কি সকলেই যাবে।” বিষ্ণু ঠাকুর বলিল “হাঁ সকলেই যাবে।”

গৃহিনী। তোমরা শ্বশুর বউয়ে দুই জনেই আমার পাছে লাগলে দেখছি। এখন ঘরে চল, বউ নিয়ে বসে থাকলে অপবাদ যে চারিদিকে রটিয়ে পড়বে। এই বলিয়া বিষ্ণু ঠাকুরের হস্ত ধরিয়া তাহাকে লইয়া গৃহে গমন করিলেন। নিস্বহায়া দেবীবালা একাকী বাহিরে বসিয়া আকাশ পাতাল কত কি চিন্তা করিতে লাগিল।

দেবীবালা এইরূপ চিন্তা করিতেছে এমন সময় তাহার পশ্চাৎ হইতে একটি চতুর্দ্দশ বর্ষিয়া যুবতী আস্তে আস্তে ডাকিল “বউ,”। দেবীবালার হঠাৎ চমক ভাঙ্গিল, পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, ঘোষদের বাড়ীর গিরিবালা তাহার পশ্চাৎ ভাগে দাঁড়াইয়া আছে। গিরিবালা আস্তেং দেবীবালার কর্ণের নিকট যেয়ে বলিল, “বউ এখন কি করিবে?”

দেবী। কি করিব?

গিরি। আমার সঙ্গে চল।

দেবী। কোথায়?

গিরি। আমাদের বাড়ী।

দেবী। তোমাদের বাড়ী গেলে তোমরা সমাজে বদ্ধ হইবে। কেন আর আমার প্রতি স্নেহ করিয়া তোমরা বিপদে পড়িবে।

গিরি। আমাদের ঘরে না যাও বাহিরে থেক।

দেবী। কেন?

গিরি। তোমার সহিত কয়েকটি কথা আছে। এখানে বলিতে গেলে, বামুন ঠাকরুণ গালি দিবেন। এই জন্যই অনেকক্ষণ যাবৎ তোমাকে ইঙ্গিতে ডাকিতেছিলাম। এ পর্য্যন্ত তোমার শাশুড়ী ঠাকুরাণীর নিকট আসিতে সাহস হয় নাই।

"আচ্ছা চল। এই বলিয়া দেবীবালা গিরিবালার পশ্চাৎ২ চলিলেন, তাহারা উভয়ে গিরিবালাদের বাড়ীর পার্শ্বস্থ একটী বৃক্ষের নিকট আসিয়া, গিরিবালা দেবীবালাকে বলিল, "তুমি যদি একান্তই আমাদের বাড়ী না যাও তবে এস্থানে থাক, আমি বাড়ী হইতে একবার আসি।" এই বলিয়া গিরিবালা তাহাদের বাড়ী-মধ্যে প্রবেশ করিল।

দেবীবালা আবার বসিয়া চিন্তা সাগরে ভাসিতে লাগিল। গিরিবালাদের বাড়ী বিষ্ণুঠাকুরের বাড়ীর অতি নিকটে এক পাড়ার মধ্যে। গিরিবালার পিতা নাই সংসারে একমাত্র মা আছেন। গিরিবালার বিবাহের পরই তাহার পিতা পরলোক গমন করিয়াছেন। গিরিবালা এখন বিধবাও নয় সধবাও নয়;. কিন্তু পতিহারা; পতির মৃত্যুর স্থিরতা হয় নাই। তাহার পতি নৌকা-রোহনে গমন করিতে ছিলেন পথিমধ্যে দস্যুগণ আক্রমণ করিয়া নৌকা জলমগ্ন করিয়া দেয়, সেই হইতে আর তাহার কোন অনুসন্ধান পাওয়া যায় নাই। নিরাশ্রয়া বালিকা এখন অতি কষ্টে মাতার নিকট অবস্থিতি করিতেছে। তাহার বড় কুস্বভাব যে, সে কাহার দুঃখ দেখিলেই গলিয়া পড়ে, তাহার হৃদয়ে আঘাত লাগে,

আর একটী দোষ যে তাহার এই মনোহর রূপটি কাহাকে বড় দেখাইতে ইচ্ছা করিত না; সে রূপের ছটা বাহির করিয়া কলসী কক্ষে হেলিয়া দুলিয়া গল্প করিতে করিতে অন্যান্য মেয়েদের ন্যায় গঙ্গায় অঙ্গনিমার্জ্জন করিতে যায় না। এই জন্য পাড়ার মেয়েদের সহিত তাহার বড় ভাব নাই। সেও তাহাদের সহিত কখন হাস গল্পে যায় না। কিন্তু সরলা দেবীবালার সঙ্গে তাহার নিতান্ত প্রণয়; কারণ দেবীবালাও একে স্নেহ করে এও দেবীবালাকে স্নেহ করিয়া থাকে, ক্রমে উভয়ের ভালবাসা দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছে, তাই আজ দেবীবালার বিপদ দেখিয়া গিরিবালা অস্থির হইয়াছে।

দেবীবালা বৃক্ষের নীচে উপবেশন করিয়া চিন্তা করিতেছে; বৃক্ষের ছায়ায় সে স্থানে সূর্য্য উত্তাপ প্রবেশ করিতে পারে নাই; এই বৃক্ষটি গিরিবালাদের বাড়ীর পশ্চিম পার্শ্বে; এস্থান দিয়া লোক জন চলাফিরার কোন রাস্তা নাই, কেবল গিরিবালাদের বাড়ী যাইবার ক্ষুদ্র পথ মাত্র। কিছু কাল পর গিরিবালা একখানি থালায় করিয়া সন্দেস প্রভৃতি কিছু মিষ্টান্ন লইয়া ঐ স্থানে উপস্থিত হইল এবং দেবীবালাকে বলিল; "এই বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিল এখন পর্য্যন্তও তুমি কিছু খাও নাই। ধর আমার অনুরোধে ইহার কিছু খাও।"

দেবী। না ভগ্নী আমাকে ও অনুরোধ করিও না, আমার এখন ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছুই নাই।

গিরি। না খাইয়া কি মরিবে?

দেবী। না খাইয়া থাকিলেও শীঘ্র মরা যায় না, যাহাতে

আমি শীঘ্র মরিতে পারি এখন তাহার বিহিত করিয়া ভগ্নীর কাজ কর।

গিরি। তবে কি নিশ্চই মরিবে? আর কি কোন উপায় নাই?

দেবী। না আর উপায় কি?

গিরি। উপায় সেই নিরূপায়ের উপায় ভগবান! আর তুমি এখন কার আদেশে মরিতে যাচ্ছ! তোমার জীবনের কর্ত্তা কি তুমি। তোমার জীবনের সেই হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতার আদেশ ব্যতিত তুমি মরিতে পার না। তাঁহার সহিত একবার দেখা কর, তিনি কি বলেন শোন, তার পর যাহা কর্ত্তব্য হয় করিও।

দেবীবালা কিঞ্চিৎকাল অধোবদনে থাকিয়া কয়েক বিন্দু অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। তাহার চক্ষে জল দেখিয়া গিরিবালার চক্ষে জল আসিল। সে তখন দেবীবালার হস্ত ধারণ করিয়া বলিল "ভগ্নি আর কাঁদিও না তোমার চক্ষে জল দেখলে আমার প্রাণে বড় আঘাত লাগে।"

দেবী। ভগ্নি! আমি কি আর ইচ্ছা করিয়া কাঁদি, ঈশ্বর যে আমাকে কাঁদবার জন্যই পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন।

এইরূপে উভয়ের কথা বার্ত্তায় অনেক সময় কাটিয়া গেল, বেলা প্রায় অবসান হইয়া আসিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

পতি সকাশে।

ক্রমে আবার সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। ভগবান মরিচীমালী অস্তগিরি শিখরে গমন করিলেন। প্রিয় সহচর তিমিরকে সঙ্গে করিয়া বিকট বদনা যামিনী আগমন করিল। দুঃখিনী দেবীবালা এখনও সেই বৃক্ষের নীচে বসিয়া গিরিবালার সহিত কথোপকথন করিতেছে এবং চোর, বদমাইস প্রভৃতি দুরাচার গণের সহায় কারিণী যামিনীর আগমন দেখিয়া চিন্তা তরঙ্গে ভাসিতেছে। দেখিতে দেখিতে পূর্ব্ব গগনে উজ্জ্বল বরণে সুধাকর, করবর্ষণ করিতে করিতে উদিত হইলেন; আজ নিশাপতিও যেন দেবীবালার দুঃখে দুঃখিত হইয়া, তাহার, উপকারার্থে, আঁধারকে পরাজয় করিয়া আগমন করিয়াছেন। আঁধার পলায়ন করিল, ক্রমে পৃথিবী জ্যোৎস্নাময়ী হইয়া উঠিল। তখন গিরিবালা দেবীবালাকে বলিল "ভগ্নি! এখন আর এস্থানে থাকা আমাদের নিরাপদ নহে, এখন চল আমাদের বাড়ী যাই।"

দেবী। শেষে তোমরা কোন বিপদে পড়িবে নাত?

গিরি। সে ভয় তোমার করিতে হবে না এখন চল।

"আচ্ছা চল" বলিয়া দেবীবালা গিরিবালার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল

দেবীবালাকে গিরিবালা তাহার মাতার নিকট রাখিয়া আস্তে২ একাকিনী বিষ্ণু ঠাকুরের বাড়ীর দিকে গমন করিল। তখন রাত্র প্রায় ৮টা বাজিয়াছে। যে গিরিবালা দিবাভাগে একাকিনী

গৃহের বাহির হইত না, আজ দেবীবালার জন্য সে রাত্রিকালে একাকিনী গমন করিতেও শঙ্কিত হচ্ছে না। আজ পরোপকারের জন্য গিরিবালা জীবন উৎসর্গ করিয়াছে। ধন্য গিরিবালা! তুমি মানবীরূপী দেবী।

গিরিবালা বিষ্ণু ঠাকুরের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া প্রবোধের শয়ন গৃহের গবাক্ষের নিকট যাইয়া দাঁড়াইল। এদিকে প্রবোধ সন্ধ্যাকালে মহল হইতে বাড়ী আসিয়াছেন, পথক্লেশে তাঁহার শরীর বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, তিনি অনতি-বিলম্বে আহারাদি করিয়া শয়ন করিয়াছেন। পিতার সহিত এ পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ হয় নাই। মাতাও দেবীবালার ঘটনা এ পর্য্যন্ত পুত্রের নিকট কিছু বলেন নাই। প্রবোধ দেবীবালাকে গৃহে না দেখিয়া মনে মনে বিবেচনা করিয়াছেন যে,দেবীবালা এখনও তাহার পিত্রালয় হইতে বাড়ী আসে নাই। শয়ন করিয়া এইরূপ নানাবিধ বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় গবাক্ষের দ্বার দিয়া মধুর কণ্ঠে গিরিবালা ডাকিল।

"দাদা! প্রবোধ দাদা!"

প্রবোধ হঠাৎ চমকিত হইয়া বলিল "কেও?"

"আমি গিরিবালা।"

"গিরিবালা! তুমি এ রাত্রকালে এখানে কেন?"

"আপনাকে একটি কথা বলিতে।"

"এমন কি কথা গিরিবালা! যে রাত্রে না বলিলেই চলিত না।

"বড় প্রয়োজনীয় কথা। সে কথার উপর একজনের জীবন রক্ষার ভার নির্ভর করে।"

"আচ্ছা বল।"

"বলি বউর কোন খবর রাখেন কি ?"

"কেন ? সে তাহার পিতৃব্যালয়ে আছে।"

"না সে এখানে আসিয়াছে। তাহার এখন বড় বিপদ, তাহা বলতেই এইরাত্র করিয়া অন্যায়রূপে আপনার নিকট আসিয়াছি।"

দেবীবালার বিপদের কথা শুনিয়া প্রবোধ অস্থির হইয়া বলিলেন "গিরিবালা! কি হইয়াছে শীঘ্র বল! আমার প্রাণ বড় অস্থির হইয়াছে। দেবীবালা ভাল আছে তো?"

"ভাল মন্দ জানিনা যাহা শুনিয়াছি, যাহা দেখিয়াছি, তাহা বলিতেছি শুনুন, শুনিয়া যাহা ভাল মন্দ বিচার কর্ত্তে হয় করুন।" এই বলিয়া গিরিবালা সংক্ষেপে দেবীবালার দস্যু কর্ত্তৃক হরণ ও অপবাদ প্রভৃতি সমস্ত ঘটনা প্রবোধের নিকট আদ্যন্ত বর্ণনা করিল। প্রবোধ এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া স্তম্ভিত হইলেন এবং কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া আকাশ পাতাল কত কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। গিরিবালা আবার বলিল, "এখন বসিয়া চিন্তা করিলে কি হইবে শীঘ্র আমার সহিত চলুন, যাহা হয় একটা বিধি ব্যবস্থা করুন, সে এতক্ষণ জীবন ত্যাগ করিত কেবল আপনার দর্শন আশাতেই এ পর্য্যন্ত জীবন রাখিয়াছে।"

প্রবোধ। কি বল্লে গিরিবালা! এতদূর হইয়াছে ?

গিরি। চলুন দেখিলেই সব বুঝিতে পারিবেন। "আচ্ছা চল" এই বলিয়া প্রবোধচন্দ্র উন্মনস্কভাবে তাড়াতাড়ী গৃহের বাহির হইয়া গিরিবালার সহিত তাহাদের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় আসিয়া দেখিলেন, স্বর্ণলতা সদৃশা দেবীবালা অবগুণ্ঠনবতী হইয়া অধোবদনে রোদন করিতেছে। যেন তাহার রূপের ছটায় ভূতলে চন্দ্রোদয় বলিয়া বোধ হইতেছে; চন্দ্রে যেরূপ কলঙ্ক তাহা-

রও বদন-কমলে বিষাদের ছায়া পতিত হইয়া সেইরূপ কলঙ্ক হই-য়াছে। দেবীবালাকে এইরূপ অবস্থায় দর্শন করিয়া, তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না "দেবীবালা! দেবি! তোমার দুর্দ্দশা দেখিয়া আমার প্রাণ বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। পুরুষ জীবিত থাকিতে স্বর্ণ-লতা সদৃশ্যা সরলা বালা পরিণীতা স্ত্রীর এমন দুরবস্থা। হায়! আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায় না কেন?" এই বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

দেবীবালা সম্মুখে তাহার আরাধনার বস্তু, সমস্ত দিবস যাহাকে একাগ্র চিত্তে চিন্তা করিতেছিল, তাঁহাকে দর্শন করিয়া আনন্দ সাগরে ভাসিতে লাগিল, তখন যে তাহার সমস্ত দুঃখ বিস্মৃত হইয়া গেল, সম্মুখে যে বিপদ-রাশী তাহা স্মরণপথের অতীত হইল। নয়ন হইতে আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। এখন স্বামীকে কি বলিয়া সম্বোধন করিবে, তাহার নিকট কি বলিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছে না; স্বামীর মুখদর্শন করিয়াই যেন স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করিতেছে। গিরিবালা উভয়ের এইরূপ ভাব দেখিয়া অবাক্ হইল। "ধন্য প্রেম প্রেমের কি অপার মহিমা;" আজি এই স্বর্গীয় প্রেম দর্শন করিয়া তাহারও জীবন সার্থক হইল। সে তখন প্রবোধকে বলিল "দাদা! এইরূপে আক্ষেপ করিলে কি হইবে; এখন ইহার উপায় স্থির কর। এই দুঃখিনী অবলাকে কি অকূল সাগরে ভাসাইয়া দিবে? না কোন উপায় স্থির করিবে। বেলা দ্বিপ্রহরের পর হইতে দেবীবালা এপর্য্যন্ত জলবিন্দুও উদরস্থ করে নাই।"

প্রবোধ। কি বল্লে? দেবীবালার এপর্য্যন্ত আহার হয় নাই, হায়! এখন ইহাকে আর কে খে'তে দিবে? আমার নিষ্ঠুরা মাতার ইহার মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়াও কি একটু দুঃখ হইল না।

গিরি। আমি সন্দেশ প্রভৃতি কিছু মিষ্টান্ন আনিয়া ইহাকে খাইবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলাম, কিন্তু দেবীবালা ইহার কিছুই খাইল না, বলিল "তিনি আসিয়া বিহিত না করিলে আর ইহ জন্মে খাইব না"; এখন তুমি আসিয়াছ, ইহাকে কিছু খাওয়াইয়া ইহার জীবন রক্ষা কর।

এই বলিয়া গিরিবালা মিষ্টান্ন সহিত সেই থালা রাখিয়া গৃহান্তরে গমন করিল। তখন প্রবোধ বলিল, "দেবীবালা আমার অনুরোধে ইহার কিছু খে'ত হবে, তোমার কষ্টে যে আমার কষ্ট হয়, আমাকে কষ্ট দেওয়া তোমার ন্যায় স্ত্রীর কর্ত্তব্য নয়। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পারি, যতদিন আমায় এ দেহে জীবন থাকিবে, ততদিন আমি তোমার ভরণ পোষণ করিব, স্ত্রীকে ভরণ পোষণ ও রক্ষা করাই ভর্ত্তার কর্ত্তব্য, যে পুরুষ তাহা না করে সে নরকগামী হয়।

দেবীবালা প্রবোধের কথায় আর দ্বিরুক্তি না করিয়া সেই মিষ্টান্নগুলি ভক্ষণ করিল। তৎপর আবার প্রবোধ বলিলেন "দেবীবালা আমি তোমাকে রাখিবার এই পরামর্শ স্থির করিয়াছি। বাড়ীতে রাখিতে যখন সমাজের ভয়ে পিতা ভয় করিলেন, আর তোমার পিতৃব্যও প্রকারান্তরে তোমায় গৃহে রাখিতে পিতাকে নিষেধ করিয়াছেন, তখন তিনিও তোমাকে রক্ষা করিবেন না, তবে এখন কোথায় যাইবে? এইস্থান হইতে দুই ক্রোশ ব্যবধান, সোমপাড়া আমার মাতুলবাড়ী, সেস্থানে মাতুলের নিকট সকল কথা বলিয়া তোমাকে রাখিয়া আসিতে চাহি। সেখানে মাসে মাসে তোমার খরচের বাবদ কিছু কিছু দিয়া, আমি মধ্যে মধ্যে তোমাকে দেখিয়া আসিব।

"আপনার যাহা ভাল বিবেচনা হয় তাহা করিবেন; কিন্তু অধিনী দুঃখিনী দেবীবালা যেন মধ্যে মধ্যে চরণ দর্শন করিতে পারে, ঐ চরণ দর্শনের আশাতেই এ দেহে প্রাণ আছে। তাহাতে বঞ্চিত হইলে দেহে জীবন থাকা সম্ভব নয়। এই বলিয়া দেবীবালা নয়ন জলে বক্ষঃ ভাসাইতে লাগিল এবং ছিন্নলতার ন্যায় তাহার পদমূলে কাঁদিয়া পড়িল।

দশম পরিচ্ছেদ।

রমানাথ বাবু।

প্রায় দুইমাস অতীত হইয়া গেল দেবীবালা প্রবোধের মাতুলালয় সোমপাড়ায় আছে। প্রবোধের মাতুল ঢাকায় কাজ করেন, কোন প্রয়োজন বিধায় ছুটী নিয়া বাড়ী আসিয়াছেন, সেই সময়েই প্রবোধ মাতুলের নিকট সমস্ত বিবরণ বলিয়া দেবীবালাকে মাতুলের বাড়ী রাখিয়া আসেন। প্রবোধের মাতুলের নাম গণেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, তিনি পুনর্ব্বার কার্য্যস্থানে গমন করিয়াছেন। দুঃখিনী দেবী বালা তাহার আলয়ে আছে, কিন্তু তাহার দুঃখের পরিসীমা নাই, একেই মনের দুঃখে সর্ব্বদা কালকর্ত্তন করিতেছে, তাহার উপর গণেশ চক্রবর্ত্তীর স্ত্রীর মুখের যন্ত্রণা। তিনি নিরপরাধিনী দুঃখিনী অবলা দেবীবালাকে সর্ব্বদাই তীব্র ভৎর্সনা করিয়া থাকেন। হায়! কি হলো. দুঃখিনী দেবীবালা যেখানে যায় সেইখানেই এইরূপ। সংসারের কি সকল গৃহিণীই একরূপ, ? তবে অভাগিনী দেবীবালা দাড়ায় কোথা ?

এই দুই মাসের মধ্যে প্রবোধ চারিবার দেবীবালার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন; কিন্তু দুর্ভাগিনী দেবীবালার দোষ যে, সে একদিনও প্রবোধের নিকট নিজ দুঃখের বিবরণ প্রকাশ করে নাই, তাহার মনে বিশ্বাস, নিজের দুঃখের কথা প্রবোধের নিকট বলিলে সেও দুঃখিত হইবে। দেবীবালা মনে করিত "আমি শত সহস্র কষ্ট পাই তবুও স্বামীর মনে যাতনা প্রদান করিব না।" কাজেই প্রবোধ এ পর্য্যন্ত তাহার কষ্টের বিবরণ কিছুই জ্ঞাত হইতে পারেন নাই, যাহা হউক দেবীবালা এই কষ্টকে কষ্ট বলিয়াই জ্ঞান করে নাই, যদিও সে বড়মানুষের মেয়ে; তথাপি বাল্যকাল হইতেই এই রূপ কষ্ট সহ্য করিয়া আসিতেছে এখন আর ইহাতে নূতন কি অধিক কষ্ট হইবে; কিন্তু সম্প্রতি সে একটা ভয়ানক ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কায় বড়ই ভীত হইয়াছে, সর্ব্বদা তাঁহার প্রাণ কাঁপিতেছে। কখন কি সর্ব্বনাশ হয় বিশ্বাস নাই। সোমপাড়ার রমানাথ বক্সি বড় বদ লোক; আজ এই দুঃখিনী দেবীবালা তাহার নজরে পড়িয়াছে। সে সর্ব্বদাই তাহার কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত সচেষ্ট; দেবীবালার সহিত দেখা হইলেই তাহার মুখের দিক তাকাইয়া মৃদু হাস্য করিয়া থাকে। এবং একটু নির্জ্জন স্থানে পাইলেই কৌশলে মনের দুরভিসন্ধির কথা ব্যক্ত করে। দেবীবালা নিতান্ত পরাধীনা সংসারের প্রয়োজনীয় কাজের জন্য বাধ্য হইয়া তাহাকে বাড়ীর বাহিরেও গমনাগমন করিতে হয়। সে একদিন দুষ্টের এইরূপ ব্যবহারের কথা গৃহিণীকে বলাতে সে তুচ্ছ তাচ্ছল্য করিয়া হাঁসিয়া উড়াইয়া দিল। তখন হইতেই দেবীবালা মনে মনে স্থির করিল। "এস্থান হইতে আমার পলাইতে হইবে, এস্থানে থাকিলে আর নিস্তার দেখিতেছি না, কোন দিন

জীবনের সার রত্ন এই সতীত্ব হারাইব। এখন যাই কোথা ? আমি যেখানে যাইব সেই স্থানেই আমার বিপদ ; বিপদ যে আমার চির সহচর হইয়াছে। তবে সেই স্থানে লুকাইত হইলে আর আমার বিপদের আশঙ্কা নাই। তথায় অরাজকতা নাই সেই স্থানে পাপীর প্রশ্রয় নাই, বরং পাপীর শাস্তির বিধান আছে। আমি এখন সেই পরম পিতা কালের কোলে আশ্রয় লইব। হায় ! সেখানে গেলে ত আর ফিরিয়া আসিতে পারিব না, আর তো সেই মুখ খানা দেখিতে পারিব না, আরতো আমি সেই পদযুগল বন্দনা করিতে পারিব না। না, সেই জীবনের একমাত্র অবলম্বন প্রাণনাথের চরণ যুগল দর্শন করিয়া তাহার অনুমতি নিয়া সেই যুগল চরণ হৃদয়ে স্থাপন পূর্ব্বক ইহলোক পরিত্যাগ করিব। আর তাঁহাকে বলিব "নাথ জন্মে জন্মে যেন এ দুঃখিনীকে চরণে স্থান দিতে কৃপণতা করেন না।" দেবীবালা দিবারাত্র এই সকল চিন্তা করিয়া প্রবোধের আগমনের অপেক্ষা করিতেছিল ; একদিন দুইদিন করিয়া দশ বার দিন গত হইল ; কিন্তু তথাপি প্রবোধ আসিয়া দেবীবালাকে দেখা দিলেন না। প্রতিবার পনর দিবসের পর আসিয়া থাকেন এবারে প্রায় মাসাতীত হইল ; তথাপি একবার আসিলেন না দেখিয়া দেবীবালা বড়ই চিন্তিতা হইল ; সে নিজের বিপদ হইতেও স্বামীর কোন বিপদ হইয়াছে আশঙ্কায় আরও অধিক চিন্তিতা ছিল। আবার এদিকেও তাহার বিপদ ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে। রমানাথ বাবু নানাবিধ বেশ ভূষায় সজ্জিত হইয়া প্রায়ই গণেশ চক্রবর্ত্তীর বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিয়া থাকে ; দেখা হইলেই দেবীবালার নিকট তাহার মন্দাভিপ্রায় ব্যক্ত করে। এইরূপ দশ পাঁচ দিন গত হইলে পর গ্রামের লোক সমস্ত কাণা-

কাণি আরম্ভ করিল, হাটে, ঘাটে, মাঠে, পণ্ডিত মহাশয়ের টোলে, স্ত্রীলোকের অন্দর মহলে, দেবীবালার কুৎসার সমালোচনা আরম্ভ হইতে লাগিল। এখন যেমন নগরের, গ্রামের সমস্ত কুসংবাদ ও সুসংবাদ সংবাদ পত্র পাঠে অবগত হওয়া যায়, তখন সেইরূপ ছিল না; আমরা লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময়ের কথা বলিতেছি, তখন সংবাদ পত্রের প্রচলন ছিল না; মুদ্রা যন্ত্রের স্বাধীনতা ছিল না; প্রতিদিন প্রতি সপ্তাহে সত্য মিথ্যা পূর্ণ রাশী রাশী কাগজ ছাপা হইয়া, ডাকযোগে প্রতি গ্রহস্থের ঘরে যাইত না। তখনকার সংবাদ পত্র ছিল, স্ত্রীলোকের অন্দরমহল। প্রতিদিনই গ্রামের কে ভাল, কে মন্দ, কে কিরূপ ব্যবহার করে, সত্য মিথ্যা সকল বিষয়ের সর্ব্বদা আলোচনা হইত। এখনকার সংবাদ পত্র যেরূপ কোন সত্য ঘটনাকে মিথ্যা জনরব বলিয়া প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করেন এবং কোন মিথ্যা ঘটনাকে সত্য বলিয়া প্রতিপাদন করেন; তখনও সেইরূপ হইত। প্রতিদিন ,ঘোষদের বাড়ী, কি বসুদের বাড়ী, কি বামুনদের বাড়ী অপরাহ্নে বৈঠক বসিত; গ্রামের সকল বাড়ীরই প্রায় সধবা, বিধবা, বৃদ্ধা, মধ্যমবর্ষীয়া স্ত্রীলোকগণ আসিয়া একত্রিতা হইত।

তাহাদিগকে কেহ নিমন্ত্রণ করিত না, কেহ সংবাদ দিত না। তাহারা আপনা আপনিই আসিয়া উপস্থিত হইত। আজ মিত্রদের বাড়ী সেই বৈঠক বসিয়াছে; গ্রামের সরলা, বিমলা, কমলা, ঠানদিদী, রাঙ্গাদিদী, হরির মা, বৃন্দার পিসী, কানাইর খুড়ী, চন্দ্রের জেঠী প্রভৃতি সকলেই একে একে আসিয়া হাজির হইয়াছেন, আজ সেইস্থানে দুঃর্ভাগিনী দেবীবালার কুৎসার সমালোচনা আরম্ভ হইয়াছে। অনেক কথার পর ঠানদিদী বলিলেন; "আমি

পূর্ব্বেই একদিন গণেশ চক্রবর্ত্তীকে বলিয়াছিলাম গণেশ ও মেয়েটাকে ঘরে রেখ না, ওটা যখন দুষ্টা হয়েছে ওকে ঘরে রাখিলে তোমার কলঙ্ক হবে।” বৃন্দার পিসী বলিল “শুনিয়াছি রমানাথ বাবু নাকি গণেশ চক্রবর্ত্তীর স্ত্রীকে কিছু দিয়া হাত করিয়া লইয়াছে।

রাঙ্গাদিদী। তাকে হাত না করিলে কি আর এতদূর হয়।

বিমলা বলিল। “ভাল মেয়েটী দেখ্‌তে এরূপ ওর পেটে এত গুণ।”

কমলা। দেখতে ভাল না হ’লে কি এত গুণ প্রকাশ কত্তে পারে তোর মত একটা কাল ভূত হইলে কি আর রমানাথ বাবু তার সর্ব্বস্ব তাকে দেয়।

বিমলাকে কুৎসিতা বলায় তাহার মনে বড় দুঃখ হইল। আর কথা কহিল না; আহা তাহার এই রূপের ছটায় স্বামী তার পদানত, আজ কিনা অনায়াসে কমলা তাহাকে কুৎসিতা বলিল।

সরলা বলিল। হাদা দিদী শুনিয়াছি রমানাথ বাবু নাকি ছুড়িটাকে অনেক গহনা দিয়াছে, কিন্তু ছুঁড়ী গহনা পরে না কেন?

কমলা। তুই বুঝি তা এখন শুনলি আমরা কোন দিন জানি। গহনা এখন পরবে কি; ওরা কি আর এখানে থাকবে; সুযোগ পাইলেই পালাইয়া যাইবে; একটা নির্জ্জন স্থানে যে’য়ে মনের হরিষে দুইজনে থাকিবে, তখন গহনা পরবে; এখন গহনা পরিলে লোকে বলবে কি? এইরূপে সেইদিন দেবীবালার কুৎসার চূড়ান্ত হইল। এক দিন দুই দিন করিয়া সেই কথা গণেশ চক্রবর্ত্তীর স্ত্রীর কর্ণে গেল; সে এই কথা শুনিয়া রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে দেবীবালার

নিকটে যেয়ে তাহাকে যথেষ্ট তিরস্কার করিয়া গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিতে চাহিলেন।

নিরপরাধিনী দেবীবালা আর কি করিবে, কেবল নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিল। ক্রমে ঘোর তিমিরা যামিনী আগমন করিলেন। দেবীবালা আর সেই দিবস রাত্রে কিছু আহার করিল না গৃহিণীর তিরস্কার খাইয়াই উদর পূর্ণ করিল। সে গৃহের মধ্যে বসিয়া কেবল নীরবে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল, আর সেই ভাসা ভাসা নয়ন দুইটী হইতে দুই এক বিন্দু করিয়া অশ্রুজল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। এদিকে গণেশ চক্রবর্ত্তীর স্ত্রী একাকিনীই আহারাদি করিলেন; রাগে রাগে একবারও দেবীবালাকে যোগ জিজ্ঞাসা করিলেন না। আহারান্তে আর শয়নও করিলেন না, তাহার মনে অভিসন্ধি থাকিল যে, রমানাথ বাবু দেবীবালার নিকট কখন আসে এবং কি ভাবে কথোপকথন করে, গুপ্তভাবে থাকিয়া ইহা দেখিবেন, এইজন্য গৃহে গমন না করিয়া গৃহের পশ্চাৎভাগে লুকাইতভাবে থাকিলেন; ক্রমে রাত্র প্রায় দশটা অতীত হইল; দেবীবালার নিদ্রা নাই, কেবল চিন্তা। রাত্র দশটার পর একবার বিবেচনা করিলেন, "বোধ হয় রাত্র এখনও অধিক হয় নাই, তাতেই গৃহিণী আসেন নাই। গৃহিণী গৃহে না আসিলে দ্বারবন্ধ করিতে পারেন না, একেই গৃহিণী যেরূপ চটিয়াছেন; যদি দ্বার বন্ধ করেন তাহা হ'লে আর রক্ষা নাই। যদি দ্বারবন্ধ করিয়া শয়ন করিয়া থাকে, গৃহিণী আসিয়া ডাকিলে একবারে প্রত্যুত্তর ও তৎক্ষণাৎ দ্বার খুলিয়া না দেয়, তাহা হইলেই প্রলয় ঘটাবেন। এই বিবেচনায় দ্বার মুক্ত করিয়াই রাখিয়াছে। এদিকে যে দ্বারমুক্ত রাখায় দুর্ভাগিনীর পদে পদে

বিপদের সম্ভাবনা তাহা একবারও মনে ভাবিতেছে না। আহা তাহা ভাবিবে কিরূপে, সে কেবল ভাবিতেছে কতক্ষণে কিরূপে এ পাপ-ময় সংসার পরিত্যাগ করিয়া সেই পরম পিতা কালের কোলে আশ্রয় গ্রহণ করিবে। আর জীবনের জীবন স্বামীর পদ যুগল চিন্তা করিতেছে; অন্য চিন্তা তাহার অন্তরে স্থান দিতেছে না। তাহাতেই রাত্র ১০টার পরও বিবেচনা করিতেছে রাত্র অধিক হয় নাই। রাত্র দশটা অতীত হইয়াছে. পৃথিবী অন্ধকারময়ী আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন; কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না, অল্প অল্প বৃষ্টি পতিত হই-তেছে। দেবীবালা একাকিনী শয্যায় শায়িত থাকিয়া চিন্তা করি-তেছে। ঘরে একটি ক্ষীণআলো নিব্ নিব্ করিয়া জ্বলিতেছিল।

এমন সময় হঠাৎ দুষ্ট রমানাথ বাবু আসিয়া সেই গৃহে উপ-স্থিত হইলেন। দেবীবালা এই রাত্র করিয়া একাকিনী অবস্থায় আছে, এমন সময় দুষ্টকে দর্শন করিয়া তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল, বাতাহত কদলীবৃক্ষের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে গৃহের একপার্শ্বে যেয়ে সমস্ত শরীর বস্ত্রাবৃত করিয়া ভয় ও লজ্জায় জড়সড় হইয়া অধোবদনে উপবেশন করিল। দুষ্ট রমানাথ মদ খাইয়া বিভোর হইয়া আসিয়াছিল। মদের গন্ধে সমস্ত গৃহ ব্যাপ্ত হইয়াছে। দুষ্ট হেলিতে দুলিতে দেবীবালার শয্যার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল "ঐ ইন্দুবরাক্ষী সুন্দরী; রাজা দুষ্মন্ত যেমন শকুন্তলার রূপ দেখিয়া তাহার প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছিল, আমিও তে মনি আজ তোমার প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছি, এখন লজ্জা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার নিকট আগমন করিয়া আমার মনোবাসনা পূর্ণ কর। তুমি মনে করিতে পার দুষ্মন্তের মত আমার বল বিক্রম নাই; তার ন্যায় আমার ঐশ্বর্য্য নাই; তাহা মনে করিওনা আমার

সকলই আছে। একবার নিকটে আসিয়া ঐ পদ্মনেত্রে দৃষ্টি করিলেই সব দেখিতে পাইবে এ দাস তোমার চিরকিঙ্কর; তুমি আমার রাজরাণী।”

দেবীবালা মনে মনে বলিল “তুমি নির্ব্বংশ যাও।”

দুষ্ট আবার বলিতে লাগিল “দেখ সুন্দরী তুমি আর চুপ করিয়া থাকিও না; তোমার ঐ চন্দ্র বদনে মধুর কথা বলিয়া আমার প্রাণ শীতল কর। আহা তোমার এই সুন্দর যৌবন কাল; বনের পলাস পুষ্পের ন্যায় কেহ মধু খাচ্ছে না; আমি আজ ভ্রমররূপে মধু পান করিতে আসিয়াছি মধু দানে কৃপণতা করিও না।”

দেবীবালা তখন মনে মনে ভাবিল, “হায় আমার মস্তকে কেন এখন বজ্র পতন হয় না; দুষ্টের এইরূপ কুৎসিৎ কথা শ্রবণ করিয়াও আমার দেহে জীবন রহিল। হায় আমার জীবন আজ নিশ্চয়ই কলঙ্কিত হইল। আজ দুষ্ট যেরূপ ভাবে আগমন করিয়াছে ইহার হস্ত হইতে যে কিছুতেই নিস্তার পাইব এমন সম্ভব করি না; এখন আমার সহায় একমাত্র সেই অনাথের নাথ জগৎবন্ধু হরি; হরি তুমি এখন কোথায়? শুনিয়াছি তুমি সর্ব্বত্রই আছ, এদাসীর বিপদ কি দেখিতেছ না? তুমি না অসুর নিসূদন; তবে কেন আজ এই দুষ্ট অসুরকে নিধন কর না; তুমি না বিপদ ভঞ্জন, দ্রৌপদীকে মহা বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলে; আজ কি এ অভাগিনীর বিপদ নাশ করিবে না।” এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে যেন তাহার মনে কিঞ্চিৎ সাহস হইল, দয়াময় হরি যেন তাহাকে অভয় প্রদান করিলেন।

সে ভাবিয়া দেখিল “এস্থানে মৃত্যুর আশ্রয় গ্রহণ করিবারও কোন উপায় নাই এবং এ দুষ্টের নিকট হইতে কোন ছলনা ভিন্ন

নিস্তার পাইবার সম্ভাবনা নাই এই ভাবিয়া সে তখন মনে মনে একটী কৌশল উদ্ভাবন করিল।

সেই কামাতুর পাপীষ্ঠ কিয়ৎকাল পর দেবীবালাকে ধরিবার জন্য তাহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল; দেবীবালা তখন ভগবানকে স্মরণ করিয়া উচ্চৈস্বরে বলিল "আমাকে স্পর্শ করিস্ না?" দেবীবালার সেই কর্কশ বাক্যে পাপীষ্ঠ স্তম্ভিত হইয়া কাঁপিতে লাগিল, আর অগ্রসর হইতে পারিল না; সতী স্ত্রীকে দুরভিসন্ধিতে স্পর্শ করা দুঃসাধ্য, সতীকে স্বয়ং ভগবান রক্ষা করিয়া থাকেন।

পাপীষ্ঠ রমানাথ কিয়ৎকাল পর বলিল "সুন্দরি! তুমি নিবারণ করিতেছ বটে; কিন্তু আমি যে তেমোর রূপে একেবারে মুগ্ধ হইয়াছি, আর যে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারি না।" এই বলিয়া পুনর্ব্বার আস্তে আস্তে দেবীবালার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তখন দেবীবালা আর অন্য উপায়ান্তর না দেখিয়া মনে মনে একটী কৌশল জাল বিস্তার পূর্ব্বক তাহাকে বলিল "দেখুন আপনার কথা বার্ত্তায় আমি অতিশয় সন্তোষ লাভ করিয়াছি, আপনি যথার্থই একজন প্রেমিক পুরুষ, তবে কিনা আমরা ভালরূপ পুরুষের পরীক্ষা না করিয়া তাহার প্রেমে আবদ্ধ হই না।"

রমানাথ বলিল "পরীক্ষা, আরও পরীক্ষা, হৃদয় মধ্যে যে তোমার বিরহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া অগ্নি পরীক্ষা হইতেছে।"

দেবী। আর আপনার পরীক্ষা দিতে হইবে না, আমার সন্দেহ গিয়াছে। এখন আপনি একটু অপেক্ষা করুন আমি ঐ পার্শ্বের ঘর থেকে একটী কাজ সারিয়া আসি।

রমানাথ আশায় উৎফুল্ল হইয়া বলিল "তবে শীঘ্র এস।"

"এই আসছি" বলিয়া দেবীবালা প্রস্থান করিল। রমানাথ বাবু আশা-পথ চাহিয়া একাকী বসিয়া রহিলেন।

ক্রমে যখন দুই ঘণ্টা অতীত হইয়া গেল, তথাপি দেবীবালা ফিরিয়া আসিল না, তখন রমানাথ বাবুর চৈতন্য হইল। সে ভাবিতেছিল "ছুড়িটে এই আসি বলিয়া গিয়াছে এখনও আসিতেছে না কেন? বোধ হয় আমাকে ফাঁকি দিয়া পালাইয়াছে; না তা কখনই নয়, ছুঁড়িটে নিশ্চয়ই আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষিনী, স্ত্রীজাতি কাহাকে ভালরূপ পরীক্ষা না করিয়া প্রেমে বদ্ধ হয় না, বোধ হয় দেবীবালা গোপনে আমায় পরীক্ষা করিতেছে। আর কেন? অনেক হইয়াছে"। এই বলিয়া অধৈর্য্য হইয়া বাহিরে আসিলেন। বাহিরে আসিয়া তন্ন তন্ন করিয়া দেবীবালার খোঁজ করিতে লাগিলেন কিন্তু কোথাও তাহাকে দেখিতে না পাইয়া বড়ই অস্থির হইলেন। ক্রমে বাটীর সমস্ত স্থান খোঁজ করিয়া সে যে গৃহে উপবেশন করিয়াছিল, সেই গৃহের পশ্চাৎ দিকে গমন করিলেন। এদিকে গৃহিনী গৃহের পশ্চাতে লুক্কাইতভাবে থাকিয়া সমস্ত দর্শন করিতে ছিলেন, তিনি যখন দেখিলেন দেবীবালা গৃহ হইতে চলিয়া গেল, আর ফিরিয়া আসিল না, দুষ্ট রমানাথ দেবীবালার জন্য অধীর হইয়া হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া অস্থির চিত্তে তাহার অনুসন্ধানে গৃহ হইতে নিক্রান্ত হইয়াছে, তখন গতিক বড় ভাল নয়। পাছে পাপীষ্ঠ নির্জ্জনে পাইয়া আমার উপরই বা কোন অত্যাচার করে, এই ভাবিয়া গৃহিণী চিন্তান্বিতভাবে পলাইবার চেষ্টা দেখিতেছিলেন। পাপীষ্ঠ রমানাথ অবগুণ্ঠনবতী গৃহিনীকে দর্শন করিয়া দেবীবালা ভ্রমে তাহার অঞ্চল ধরিয়া আকর্ষণ করিতে করিতে বলিল "প্রিয়ে আর কেন? যথেষ্ট হইয়াছে, তোমার বিরহে আমি

উন্মাদ হইয়াছ।” তখন গৃহিণী অস্থির হইয়া ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন “হাঁরে আঁটকুড়ীর বেটা তোর মরণ নেই, তুই এইরূপে রাত্রিকালে ভদ্রলোকের বাড়ী আসিয়া গৃহস্থের বউ ঝির অপমান করিতেছিস্। আমি কালই তোকে দেখাব; আমি যদি তোর এ কাজের প্রতিশোধ না দিই, তা হলে আমি বাপের জন্মা নই।”

গৃহিনীর মধুর বাণী শ্রবণ করিয়া রমানাথ বাবু অনতি বিলম্বে ভয়ে জড়সড় হইয়া আস্তে আস্তে পলায়ন করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

চন্দ্ররায়ের কারাবাস।

প্রবোধ এই দেড়মাসের মধ্যে একবারও দেবীবালার খবর করিতেছেন না কেন? পাঠক অবশ্যই তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। এখন একবার প্রবোধকে পাঠকের নিকট উপস্থিত করিতেছি। পাঠক দেখিয়া শুনিয়া সন্দেহ ঘুচাইয়া লউন।

প্রবোধ বাবু আজ বড়ই অস্থির, তাহার মনিব চন্দ্ররায় একটি জাল মোকদ্দমায় বন্দি হইয়া কলিকাতায় ইংরেজের কারাগারে আবদ্ধ আছেন। তাহাতেই আজ তিনি মনিবের উদ্ধারের জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন; তাঁহার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই কি রূপে মনিবকে উদ্ধার করিবেন সদা সর্ব্বদা কেবল সেই চেষ্টায় আছেন, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া দিবা-নিশি কেবল চন্দ্র-রায়ের মুক্তির চিন্তায়ই বিব্রত। এই জন্যই এই দেড় মাসের মধ্যে

প্রবোধ তাহার আদরণীয়া নিস্বহায়া সরলা দেবীবালার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই।

দেখিতে দেখিতে প্রায় দুই মাস অতীত হইয়া গেল, এ পর্য্যন্ত চন্দ্ররায় কারাগারেই আবদ্ধ আছেন। প্রবোধ যে, এত চেষ্টা করিতেছেন তাহার সমস্তই ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় বিফল হইয়া যাইতেছে; বরং মোকদ্দমা দিনের দিন আরও কঠিন হইয়া উঠিতেছে। এই মোকদ্দমায় গভর্ণমেণ্ট স্বয়ং বাদী হইয়াছেন এবং এক সঙ্গে তাহার নামে আরও কতকগুলি অভিযোগও উপস্থিত হইয়াছে। অনেক বড় বড় লোক তাহার বিরুদ্ধে চলিতেছেন। কেহ কেহ বলিতেছেন "ইহার ফাঁসি হওয়া উচিত কেন না জাল মোকদ্দমায় ইতি পূর্ব্বে যখন মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি হইয়াছে; তখন ইহার অবশ্যই ফাঁসি হওয়া কর্ত্তব্য।" এইরূপে মোকদ্দমা ক্রমে কঠিন হইয়া উঠিতে লাগিল, প্রায় ছয় মাস গত হইয়া গেল; কিন্তু এ পর্য্যন্ত ইহার কোন একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইল না দেখিয়া চন্দ্ররায় মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে, এবার আর তাহার অব্যাহতি নাই। কারা গৃহ যে, কি ভয়ানক যন্ত্রণাপ্রদ স্থান, তাহা চন্দ্ররায় এখন সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। তিনি তাঁহার বিশ্বাস্য কর্ম্মচারী প্রবোধকে হুকুম করিয়াছেন যে, "আমার সমস্ত সম্পত্তির বিনিময়েও জীবন রক্ষার চেষ্টা করিবে" প্রবোধও তদনুরূপ কার্য্য করিতেছেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার চেষ্টার ফল কিছুই হয় নাই। নিজ প্রাধান্য সকলেই দর্শন করিয়া থাকে; প্রবোধ মনে করিতেছেন তাহার চেষ্টাতেই এপর্য্যন্ত মোকদ্দমা স্থগিত রহিয়াছে নতুবা এতদিনে চন্দ্ররায়ের ফাঁসি হয়ে যে'তো। বাস্তবিক যে চন্দ্ররায় এতদিনে

ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলিতেন তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা যে কেবল প্রবোধের চেষ্টায় স্থগিত রহিয়াছে এ কথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না, ইহার মধ্যে অবশ্যই একটু গূঢ় কারণ আছে। যখন চন্দ্ররায় বন্দিভাবে কলিকাতায় উপনীত হয়েন, সেই সময়েই লর্ড কর্ণওয়ালিস্‌কে তাহার পরম বন্ধু হরিদাস ভট্টাচার্য্য কোথা হইতে এক পত্র লিখেন যে, "আমি কলিকাতা আগমন না করা পর্য্যন্ত চন্দ্ররায়ের মোকদ্দমার কোন নিষ্পত্তি না হয়।" সেই জন্যই কর্ণওয়ালিস্ এ পর্য্যন্ত মোকদ্দমার কোন চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করেন নাই।

চন্দ্ররায় এত সুখভোগের পর এই নূতন বিপদে পতিত হইয়াছেন, ছয় মাস গত হইয়া গেল, স্ত্রী পুত্র আত্মীয় স্বজনের মুখদর্শনে এপর্য্যন্ত বঞ্চিত; কারাগারের বিষম যন্ত্রণায় তাহার মুখ সর্ব্বদাই মলিন, ভাবিয়া ভাবিয়া শরীর শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। এই ছয় মাসের মধ্যে এক দণ্ডের জন্যও মনের শান্তি নাই। আহার নিদ্রা একরূপ বর্জ্জিত। সর্ব্বদা দুশ্চিন্তারূপ অনলে হৃদয়কে ভস্মীভূত করিতেছে।

এক দিবস রজনীতে বসিয়া চিন্তা তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন "আর এত কষ্ট কতদিন ভোগ করিব, ইহা অপেক্ষা আমার মৃত্যুই শতগুণে শ্রেয়" মরিয়া লোক কোথায় যায়? "যমের বাড়ী" উঃ সে স্থানেও যে নিস্তার নাই তথায়ও পাপীর শাস্তি বিধান আছে, আমার ন্যায় মহাপাপীর যে, কি শাস্তি বিধান হইবে তাহা সেই বিধান কর্ত্তা বিধাতা ভিন্ন আর কেহই বলিতে পারেন না, হায় আমি কি পাপই না করিয়াছি" ভাবিতে ভাবিতে চন্দ্ররায় অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন, তিনি অচৈতন্যাবস্থায়

স্বপ্নে সমস্ত পাপের চিত্র দর্শন করিতে লাগিলেন, তিনি যাহা-দের যাহাদের অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন, তাহারা যেন ভীষণ আকৃতি ধারণ করিয়া তাহাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছে। তিনি ভয়ে উচ্চরবে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। প্রহরীগণের কর্কশ ধমকে চৈতন্য হইল। উঠিয়া নেত্র মার্জ্জনা করিয়া আবার চিন্তা করিতে লাগিলেন। "আহা! আমি অর্থের লোভে সেই প্রাণসম ভ্রাতার জীবন সর্ব্বস্ব পুত্র সতীশকে অনায়াসে হাতে ধরিয়া প্রাণ বিনাশের নিমিত্ত দস্যুহস্তে সমর্পণ করিয়াছি। উঃ আমার কি কঠিন হৃদয়" ভাবিতে ভাবিতে অচৈতন্য হইলেন আবার স্বপ্নে দেখিলেন, যেন সতীশ আসিয়া পদপ্রান্তে বসিয়া বলিতেছে। "খুড়ো মহাশয় আপনিই এই সমস্ত বিষয় ভোগ করুন, আমি অকপটে ইহা পরিত্যাগ করিতেছি; আপনি যখন বিষয় ভোগের জন্য এত লোলুপ্ তখন আর আমার উহাতে স্পৃহা নাই। আমি আপনার দাস, দাসকে চরণে স্থান দিলেই সুখী হইব; আর কিছুই প্রার্থনা করি না" চন্দ্ররায় আবার স্বপ্নে "সতীশ প্রাণের সতীশ তুমি জীবিত আছ" বলিয়া কাঁদিয়া উঠি-লেন। প্রহরীগণের তাড়ায় আবার চৈতন্য হইল। বসিয়া চিন্তা তরঙ্গে ভাসিতে লাগিলেন এবং মনে মনে নিজ দুষ্কার্য্য সকল চিন্তা করিয়া শোকে দুঃখে অধীর হইয়া নয়ন-জলে বক্ষ ভাসাইতে লাগিলেন; হায়! আমার ন্যায় এরূপ নৃসংশ রাক্ষস আর এ পৃথিবীতে দ্বিতীয় নাই। আমি অর্থের লোভে কি দুষ্কার্য্যই না করিয়াছি। আহা! সেই নিরপরাধিনী, সরলা, দেবীবালার প্রাণ নাশের জন্য কত ষড়যন্ত্র করিয়াছি। অবশেষে তাহাকে পথের ভিখারিনী করিয়া অকূল সাগরে ভাসাইয়া দিয়াছি।

এই সকল বিষয় চিন্তা করিতে করিতে আবার অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন, আবার স্বপ্নে দেখিলেন যেন, তিনি বিষম রোগের যন্ত্রণায় ছট ফট করিতেছেন; সেই স্বর্ণ প্রতিমা সদৃশা দেবীবালা তাঁহার পদ-প্রান্তে বসিয়া তাহার সুশ্রূষা করিতেছে, আর মধ্যে মধ্যে নেত্রধারা দুই গণ্ডস্থল বহিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে। আবার "দেবী! দেবীবালা! তুমি এ রাক্ষসের নিকট আবার আসিয়াছ! আমি যে তোমার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য এত চেষ্টা করিয়াছি তাহা কি তুমি জানিতে পার নাই।" এই বলিয়া উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। প্রহরীগণ চুপরহ হারামজাদ," প্রভৃতি সুমিষ্ট বাক্যে সান্ত্বনা করিল। তিনি আবার বসিয়া চিন্তা সাগরে ডুবিলেন। হায়! আমি এত দিন এই কারাগারে পচিয়া মরিতেছি। এখন দাদা কোথায়? দাদা জীবিত থাকিলে কখনই আমার এত বিপদ ঘটিত না। কখনই আমি এতকাল কারাগারে পচিয়া মরিতাম না। তিনি অবশ্যই ইহার একটা না একটা বিহিত করিতেন, গোবিন্দ রায়ের অসীম প্রতাপ ও বুদ্ধির প্রশংসা কেনা করিত, হায়! আজ কিনা তাহার সহোদ ছয় মাস যাবৎ কারাগারে পচিয়া মরিতেছে। দাদা গো এখন তুমি কোথায় একবার আসিয়া দেখিয়া যাও তোমার পাপীষ্ঠ কনিষ্ঠ ভাই আজ কি বিষম পাপের ফলই না ভোগ করিতেছে।" এই সমস্ত চিন্তা করিতে২ আবার অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। আবার অচৈতন্য অবস্থায় স্বপ্নে দেখিলেন; যেন স্বর্গ হইতে তাঁহার দাদা গোবিন্দ রায় আসিয়া তাহাকে বলিতেছেন "ভাই আর তোমার ভয় নাই। তোমার পাপের শাস্তি ভোগ যথেষ্ট হইয়াছে এখন আমার সহিত চল।" এই বলিয়া

তিনি প্রস্থান করিলেন, চন্দ্ররায় হাত বাড়াইয়া তাহাকে ধরিবার জন্য চেষ্টা করিলেন এবং "দাদা দাঁড়াও দাঁড়াও এক বার তোমাকে দেখি" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। প্রহরীগণ বার বার নিদ্রায় ব্যাঘাৎ হইতেছে বলিয়া বড়ই চটিয়া উঠিল এবং রায় মহাশয়কে কিঞ্চিৎ উত্তম মধ্যম দিয়া ক্রোধের শান্তি করিয়া আবার বসিয়া নিদ্রাদেবীর শরণাপন্ন হইল, আবার নাক ডাকিতে লাগিল।

চন্দ্ররায় আবার বসিয়া আকাশ পাতাল কত কি চিন্তা করিতে লাগিলেন, তাহার হৃদয় চিন্তা-তরঙ্গে হাবুডুবু খাইতেছিল, একরূপ বাহ্-জ্ঞান শূন্য। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার চৈতন্য হইল। তিনি দেখিলেন সম্মুখে একজন জ্যোতিষ্মান মহাপুরুষ দণ্ডায়মান, তাহার অলৌকিক রূপ দর্শন করিয়া চন্দ্ররায় অবাক্ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। মহাপুরুষের ব্রহ্মচারীবেশ, গলায় রুদ্রাক্ষমালা, পরিধানে গেরুয়া বসন, মস্তকে জটাজুট বিলম্বিত। এই অপূর্ব্ব বেশধারী মহাপুরুষকে দর্শন করিয়া চন্দ্ররায়ের প্রথমতঃ দেবতা বলিয়া ভ্রম জন্মিয়াছিল, তিনি মনে করিয়াছিলেন, বুঝি বিধানকর্তা বিধাতা আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া দুঃখ নিবারণ করিতে এস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। কিয়ৎকাল পরেই তাঁহার সে ভ্রম দূর হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন আগন্তুক দেবতা নয়। একটী মহাপুরুষ ব্রহ্মচারী।

ব্রহ্মচারী ক্রমে চন্দ্ররায়ের মস্তকের নিকট আসিয়া উপবেশন করিলেন, চন্দ্ররায় অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন "প্রভো! আপনি কে?" এবং কি নিমিত্তই বা এই অসময়ে অধমের নিকট আগমন করিয়াছেন?"

"আগন্তুক বলিল আমার নাম হরিদাস ভট্টাচার্য্য। আমি তোমার উপকারের নিমিত্তই এস্থানে আগমন করিয়াছি। কোন ভয় নাই। এখন বল তুমি কি এই কারাগারে পঁচিয়া পঁচিয়া ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিবে, না মুক্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিবে?"

চন্দ্র। প্রভো! এ অধম কি মুক্ত হইতে পারিবে।

আগ। মুক্ত হইতে পারিবে কিন্তু,—

চন্দ্র। কিন্তু কি প্রভো!

আগ। তোমার নামে অনেক অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তোমার মুক্তি বড়ই কঠিন, তবে আমি ইহার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়া একটী উপায় স্থির করিয়াছি। কিন্তু তাহাতে অনেক টাকার প্রয়োজন।

চন্দ্র। কত টাকা লাগিবে প্রভো! জীবন অপেক্ষা ইহ জগতে আর প্রিয়বস্তু কি আছে, যদি এখন আমার সমস্ত সম্পত্তির বিনিময়েও জীবন রক্ষা হয় আমি তাহাতে প্রস্তুত আছি।

আগ। যথার্থই কি তুমি তোমার সমস্ত সম্পত্তির বিনিময়ে জীবন চাও।

"প্রভো! আমি যদি এখন আমার সমস্ত সম্পত্তি বিনিময়েও জীবন রক্ষা করিতে পারি তাহাতে প্রস্তুত আছি; কেননা অর্থই এ সংসারে অনর্থের মূল, এখন যদি কোনরূপে জীবন রক্ষা হয় তবে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিব, আর পূর্ব্বকৃত পাপের জন্য সর্ব্বদা অনুতাপ করিয়া পাপভারের লাঘব করিব" এই বলিয়া চন্দ্ররায় বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন তাঁহার দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রুজল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। আগ-

ন্তুক তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন "তবে কল্যই তুমি মুক্ত হইতে পারিবে; কিন্তু অদ্যই টাকার প্রয়োজন।"

চন্দ্র। কত টাকা?

আগ। সব সহিত তিন লক্ষ টাকার প্রয়োজন।

চন্দ্ররায় এত টাকার কথা শ্রবণ করিয়া আবার বিমর্ষ হইলেন, তাহার হৃদয়ে এক অভাবনীয় চিন্তা-তরঙ্গ তোলপাড় করিতে লাগিল, তিনি বিষাদে ম্রিয়মাণ হইয়া ফেল্ ফেল্ করিয়া আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; কপোলদেশ হইতে স্বেদ নির্গতহইতে লাগিল। তাঁহার এইরূপ অবস্থা দর্শন করিয়া আগন্তুক বলিলেন "কি তুমি যে চুপ করিয়া রহিলে?"

চন্দ্র। প্রভো! তবে আমি আর উদ্ধার হ'তে পারিলাম না।

আগ। কেন?

চন্দ্র। এখন এত টাকা কোথায় পাইব?

আগ। কেন? তোমার সম্পত্তির বিনিময়ে।

চন্দ্র। আমার সমস্ত সম্পত্তির মূল্য এত অধিক টাকা যে হইবে তাহার বিশ্বাস কি? আর এখন সে সমস্ত বিষয় শীঘ্র বিক্রয়ই বা কিরূপে করি?

আগ। কেন তোমাদের যে অনেক সম্পত্তি ছিল।

চন্দ্র। ছিল, এ নরাধমই সে সমস্ত নাশের মূল।

আগ। এখন যাহা আছে তাহার মূল্য কি তিন লক্ষ টাকাও হইবে না।

চন্দ্র। উচিত মূল্য হইতে পারে; কিন্তু আমি এখন সমস্ত সম্পত্তি এই মূল্যে বিক্রয় করিতে পারিব বলিয়া বিশ্বাস হয় না।

তবে আমি আপনার কথানুসারে নায়েবের নিকট পত্র লিখিয়া বিক্রয়ের চেষ্টা দেখিতে পারি।

আগ। এখনি যে টাকার দরকার।

চন্দ্র। দুই চারি দিন বিলম্বে হইবে না।

আগ। না বিলম্ব করিলে চলিবে না, কল্যই যে তোমার বিচার হইবে; বিচারে ফাঁসির হুকুম হইবারই অধিক সম্ভব, হুকুম হইলে আর কোন উপায় নাই।

চন্দ্ররায় ফাঁসির কথা শ্রবণ করিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন এবং কাঁপিতে কাঁপিতে কাতরস্বরে বলিলেন, "তবে প্রভো আমার আর উদ্ধারের উপায় নাই।"

আগ। উপায় নাই কেন? উপায় অবশ্যই আছে, আমি কি এর একটা বিহিত না করিয়া এখানে আসিয়াছি; তবে তাহা তুমি এখন সরল অন্তঃকরনে স্বীকৃত হইবে কি না বলিতে পারি না।

চন্দ্র। বলুন্ বলুন্ আমার উদ্ধারের যদি কোন উপায় থাকে তবে তাহা সত্বর বলুন্ আমি এখনি তাহা করিতে প্রস্তুত আছি।

আগ। তোমার সমস্ত বিষয় খরিদ করিতে একটি লোক স্বীকৃত আছেন এবং আমি তাহার সহিত ইহার মূল্যাদিও নির্দ্ধারণ করিয়া আসিয়াছি। এখন তুমি স্বীকৃত হইলেই উদ্ধার হ'তে পার।

চন্দ্র। "যদি জীবন রক্ষা হয়, কারাগার হ'তে মুক্ত হইতে পারা যায়, তবে আর আমার ইহাতে কিছু মাত্র অমৎ নাই।

আগ। তুমি যে এক কালীন সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া একেবারে নিস্ব হইয়া পড়িবে।

চন্দ্র। তা কি করিব প্রভো! আমার ন্যায় মহা পাপার পরিণামে যে, এইরূপ দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইবে তাহা আশ্চর্য্যের

বিষয় নয়। হায়! আমি প্রতারণা করিবার নিমিত্ত যে সকল নৃশংসের ন্যায় কার্য্য করিয়াছি, তাহার প্রতিফল কি ভোগ করিতে হবে না? যাহা হউক এখন আমার সমস্ত বিষয় গেলেও তাহাতে আমার ইষ্ট বই অনিষ্ট নাই, এই বিষতুল্য বিষই আমার যত অনর্থের মূল। এখন যদি একবার মুক্ত হ'তে পারি, তবে বিষয় ছাড়িয়া বনে বনে ঘুরিয়া তাহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিব। তাহা হ'লে যদি এ পাপ ভারের কিঞ্চিৎ লাঘব করা যায়, নতুবা আর কিছুতেই এ গুরু পাপ ভার বহন করিতে সক্ষম হইব না।" এই বলিয়া চন্দ্ররায় আগন্তুকের পা জড়িয়ে ধ'রে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। আগন্তুকেরও নয়ন হইতে অশ্রুজল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল এবং তিনি সান্ত্বনাবাক্যে চন্দ্ররায়কে বলিলেন "আর কাঁদিও না তোমার কষ্টের অবসান হইয়াছে। দয়াবতী দেবী রাণী অদ্যই টাকা দিয়া তোমার মুক্তির পথ পরিষ্কার করিবেন স্বীকার করিয়াছেন। এখন চল সেই দয়াবতীর সহিত সাক্ষাৎ করিগে" এই বলিয়া তিনি তাহার বন্ধন মুক্ত করিয়া দিলেন, তৎপরে উভয়ে নীরবে কারাগার হইতে বহির্গত হইয়া চলিয়া গেলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

গঙ্গা বক্ষে আত্ম বিসর্জ্জন।

পাঠক রমানাথ বাবুর নিকট হইতে দেবীবালা কৌশল করিয়া গমন পূর্ব্বক এ পর্য্যন্ত কোথায় কি ভাবে অবস্থান করিতেছে, চলুন একবার তাহার অনুসন্ধান করিয়া আসি।

অভাগিনী দেবীবালা রমানাথ বাবুকে ছলনা পূর্ব্বক গৃহ ছাড়িয়া সেই ঘোরতিমিরা রজনীতেই তাহার সর্ব্বস্ব ধন সতীত্ব রত্নটী অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য প্রাণপণে ছুটিয়াছে। কোথায় চলিয়াছে, কোন দিকে গমন করিতেছে, তাহার কিছুমাত্র জ্ঞান নাই। যে দিকে পা চলিতেছে সেই দিকেই গমন করিতেছে। পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টিপাত করিতে সাহস হচ্ছে না, তাহার যেন জ্ঞান হইতেছে যে, দুষ্ট রমানাথ এখনও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে।

এইরূপে অভাগিনী প্রাণপণে দৌড়াইয়া অনেক দূর গমন করিলে পর অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল; আর চলিতে সক্ষম হইল না। কণ্টকবিশিষ্ট ক্ষেত্র মধ্য দিয়া দ্রুতবেগে গমন করাতে চরণ যুগল ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছে, অনর্গলধারায় ক্ষতস্থান হইতে শোনিত নির্গত হইতেছিল; কিন্তু তাহাতেও তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। বুঝি বা রমানাথ আসিয়া ধরিল, তাহার সর্ব্বনাশ করিল, এই ভাবনায় অস্থির হইয়া উন্মাদিনীর ন্যায় ছট্ ফট্ করিতে লাগিল, আর দেহভার বহন করিয়া চলিতে সক্ষম হইল না, কাজেই রাস্তার এক পার্শ্বে উপবেসন করিতে হইল; তখন রাত্রি প্রায় ত্রিযাম অতীত হইয়া চতুর্থযামে পতিত হইয়াছে। আকাশ পরিষ্কার। কোন স্থানে একটু মেঘের চিহ্ন মাত্র নাই; আজ কৃষ্ণ পক্ষীয়

একাদশী তিথি, চন্দ্রদেব উদয় হইয়া অল্প অল্প কিরণ প্রকাশ করিতেছেন। আহা! সেই সময় প্রকৃতি-সতী এক অপূর্ব্ব সাজে সজ্জিতা হইয়া জগতের কি অপার শোভা বিস্তার করিতে ছিলেন।

দেবীবালা তখনও বসিয়া চিন্তা করিতেছিল, "হায়! আমি এখন কি করি, কোথায় যাই; কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এখন রক্ষা পাইব? স্ত্রী জাতি আশ্রয়-তরু হইতে চ্যুত হইলে আর তাহার এ জগতে স্থান নাই। তবে আমি এখন কোথায় যাই? আমাকে আর কে আশ্রয় দিবে? কেন? সেই অনাথের নাথ! দীনবন্ধু নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, বিপদের কাণ্ডারী, জগতের সুখ দুঃখ দাতা, বৈকুণ্ঠবিহারী হরির অভয় পদ আশ্রয় করিলে আর ভয় কি"? এইরূপে একাকিনী বসিয়া চিন্তা তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে নয়ন-জলে বক্ষঃ প্লাবিত করিতেছিল। কিয়ৎকাল পর হঠাৎ তাহার মনে এক অভূত পূর্ব্ব সাহস আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার অন্তরে আর কিছুমাত্র ভয়ের চিহ্ন লক্ষিত হয় না, হৃদয়ে কি এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইয়া অধর প্রান্তে ঈষৎ হাঁসি দেখা দিল; কিন্তু ক্ষণপ্রভার ন্যায় সেই হাঁসি ক্ষণকাল মধ্যেই বিলীন হইয়া গেল, আবার দুশ্চিন্তা রূপ কালমেঘ আসিয়া তাহার বদন আবৃত করিল।

পাঠক আপনারা বলিতে পারেন কি দেবীবালার এ দুঃসময়ে অধর প্রান্তে হাঁসি কেন? "মৃত্যু" উঃ কি ভয়ানক কথা। অভাগিনী এই জন্যই বুঝি তোমার মুখে হাঁসি দেখিয়াছি। তুমি আত্মহত্যা করিবে, এই জন্যই বুঝি তোমার এত সাহস। তবে আবার বিমর্ষ কেন? মরিতে কি মনে ভয় হয়?

দেবীবালা বসিয়া বসিয়া চিন্তা করিতে করিতে মৃত্যুই স্থির সঙ্কল্প করিল। 'যদি এখনও মরিতে পারা যায় তবে এজন্ম অকলঙ্কিত

ভাবেই কাটাইলাম, তবে আর ভয় কি?" মৃত্যুতে যাহার ভয় নাই তাহার হৃদয়ে অবশ্য সাহস আছে, আজ দেবীবালার মৃত্যুতে আনন্দ, "একবার কালের কোলে আশ্রয় করিলেই নরকুলাঙ্গার গণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলাম," এইরূপ আশায় উৎফুল্ল হইয়া দেবীবালা আজ মৃত্যুতেও আনন্দ প্রকাশ করিতে ছিল, আবার কি ভাবিয়া বিমর্ষ হইল? বুঝিবা মৃত্যুতে তাহার একটু দুঃখ উপস্থিত হইল, সে ভাবিল "মরিব সত্য; কিন্তু মরিয়া কোথায় যাইব? সেখানে কি আর তাঁহাকে দেখিতে পাইব, আর কি তাহার মৃদু মধুর স্নেহমাখা কথা শ্রবণ করিতে পারিব? না তা কখনই না, আমি তাহাকে ছাড়িয়া লোকান্তর গমন করিলে আর তাহাকে দর্শন করিতে পারিব না। তবে কি জন্মের শোধ একবার তাহার শ্রীচরণ দর্শন করিয়া যাইব, না তাহা হইবে না। তাঁহাকে দর্শন করিতে পদে পদে অনেক বিপদের আশঙ্কা। রজনী প্রভাতেই আবার আমার পরম শত্রু নরকুলাঙ্গারগণ আমার সর্ব্বনাশ করিতে বাহির হইবে। আমি এই শত্রুর হস্ত হইতে যত শীঘ্র নিস্তার পাইতে পারি এখন আমার তাহাই কর্ত্তব্য। ইহ জন্মে আর আমারকষ্ট দূর হইবে না; আর স্বামির পদসেবা করিয়া সুখী হইতে পারিব না; কাজেই আর আমার বাঁচিয়া ক্ষণকালের জন্যও সুখ নাই। অতএব এখন পরম পিতা কালের কোলে আশ্রয় লইয়া চিরশান্তি লাভ করি"।

এই ভাবিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ক্রমে পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে করিতে ভাবিতে লাগিল "এখন আমি কিরূপে এই নরকতুল্য নর-রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া লোকান্তরে গমন করি? কেন ঐ যে অদূরে পুণ্যপ্রবাহিনী পতিত উদ্ধারিনী জাহ্নবী বক্ষঃ-

বিস্তার করিয়া আছেন, তিনি কি আমাকে গ্রহণ করিবেন না? অবশ্য করিবেন; তাঁহার সকলের প্রতিই সমান দয়া, পাপিনী বলিয়া কি দুঃখিনীকে আশ্রয় দিবেন না? তবে এত পাপী তাঁহার গর্ভে উদ্ধার হয় কিরূপে? তবে পতিত উদ্ধারিণী তাঁহার নাম হইল কেন? তিনি অবশ্যই পাপিনীকে আশ্রয় প্রদান করিবেন।" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দেবীবালা জাহ্নবী তটে উপস্থিত হইল। সযৌবনা যুবতীর ন্যায় ষোল কলায় পরিপূর্ণা ভাদ্রমাসের গঙ্গা সবেগে চলিতেছেন, আজ যেন দুইকুল নিমগ্ন করিয়া গোকুলবিহারীর পদোদ্ভবা জীবকুল উদ্ধারিণী ভাগিরথী কুল্‌কুল্‌ স্বরে সগরকুল উদ্ধার করিতে দেবীবালার দুঃখ দেখিয়া কিছু দ্রুতবেগে গমন করিতেছেন। পাপ তাপ নাশিনী পতিত উদ্ধারিণীর বক্ষঃ দিয়া কত পাপীর পাপ দেহ ভাসিয়া যাইতেছে। সেই পাতকীদিগকে যেন জাহ্নবী উদ্ধার করিতে অনিচ্ছুক হইয়া সবেগে চলিয়াছেন, কিন্তু পাপীর পাপদেহ তাহার পশ্চাৎ ছাড়িতেছে না। তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে।

দেবীবালা কিছুক্ষণ দাড়াইয়া গঙ্গা-বক্ষের অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করিল; কিছুতেই তাহার শান্তিবোধ হইল না, বরং হৃদয়ের আগুণ দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল। এ অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে একবার সতৃষ্ণ নয়নে গঙ্গাবক্ষে দৃষ্টি করিয়া বলিল "আর কেন? এখন মায়ের কোলে জন্মের মত আশ্রয় গ্রহণ করি।" এই বলিয়া দাঁড়াইয়া করযোড়ে সুরধনীর অনেক স্তব-স্তুতি করিল। তাহাতেও যেন মনে শান্তিবোধ হইল না, তখন নির্ভয় অন্তরে ভক্তি গদগদ চিত্তে, পঞ্চমে পঞ্চম মিলাইয়া নিশীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া গঙ্গার স্তব গান আরম্ভ করিল।

দেশ কাওয়ালী।

কলুষ বিনাশিনী গঙ্গে, হেরগো অপাঙ্গে মা।
বিষ্ণুপদে উদ্ভব, শিরে ধরেন সদাশিব,
ব্রহ্মা কমণ্ডলে তব আবির্ভাব রঙ্গে॥
পাতালেতে ভোগবতী, মহীতলে ভাগিরথী,
গোলোকে বিরজা খ্যাতি, অসীমা তব মহিমা তরল তরঙ্গে।
সগর রাজার বংশ, ব্রহ্ম শাঁপে হইল ধ্বংস,
আপনি হলেন অবতংস, পরশি বারি গেল তরি,
সবংশে পাপাঙ্গে॥
শতেক যোজন থেকে, যদি গঙ্গা ব'লে ডাকে,
বৈসে গিয়া ব্রহ্মলোকে, তব কৃপাতে বিহরে দেবগণ সঙ্গে।
শুনিগো বেদের উক্তি, দরশনে পরশনে মুক্তি,
গঙ্গৈব পরমংগতি, ওপ দীনের আসরে, যেন ঢেউ লাগে অঙ্গে॥

গান সমাপ্ত করিয়া করযোড়ে বলিল, "আর কেন এখন যাই। যাবার সময় আর একবার সেই আরাধ্য দেবতার ধ্যান করিয়া লই, এই বলিয়া ভক্তি গদ গদ চিত্তে অশ্রুপূর্ণ লোচনে গঙ্গাবক্ষে লম্ফ প্রদান করিল। অদূরে একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ উচ্চৈস্বরে "কি কর কি কর জীবন বিসর্জ্জন করিওনা" এই বলিয়া দৌড়িয়া আসিয়া দেবীবালাকে ধরিবার জন্য চেষ্টা করিলেন, দেবীবালার কর্ণে সেই শব্দ প্রবেশ করিল বটে, কিন্তু আর ফিরিতে পারিলনা। গঙ্গা স্রোতে ভাসিয়া চলিল। ব্রাহ্মণ তাহাকে ধরিতে না পারিয়া ব্যাগ্রতার সহিত গঙ্গা গর্ভে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক বেগে সন্তরণ করিতে লাগিলেন, প্রবল স্রোতের বেগে উভয়েই ভসিয়া চলিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

অরণ্যাশ্রমে।

বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে, এখনও রৌদ্র খাঁ খাঁ করিতেছে; পাখীকুল নিরবে বৃক্ষের শাখায় পত্রের নিম্নে বসিয়া আতপ-তাপ নিবারণ করিতেছে। জয়পুরের অরণ্য নিরব। একটি হিংস্রজন্তুও একটু টুশব্দ করিতেছে না। অরণ্যের মধ্যপ্রদেশে একখানা মনুষ্যের আবাসস্থান। ঐ স্থানে তিনখানা গৃহ, তাহার একখানা গৃহে দুইটী সুন্দরী কামিনী বসিয়া একটী পীড়িতা যুবতীর শুশ্রূষা করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে একটী বৃদ্ধ আসিয়া তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া যাইতেছেন। এইরূপে কিয়ৎকাল গত হইলে পর পীড়িতা যুবতীর চৈতন্য হইল, সে একবার নয়ন উন্মিল করিয়াই আবার নিমিলিত করিল; তখন একটী কামিনী তাহার কর্ণের নিকট মুখ নিয়া আস্তে আস্তে বলিল "আপনার শরীর কি এখন একটু সুস্থ বোধ হইতেছে।" যুবতী নয়ন উন্মিলন করিয়া কামিনীদ্বয়ের মুখপ্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক বলিল "আমি এখন কোথায় আছি।" একটী কামিনী বলিল "আপনি কোন চিন্তা করিবেন না এখানে কোন ভয় নাই।"

"এইস্থান কি পৃথিবী না কোন দেব রাজ্য?"

"পৃথিবীর মধ্যেই বটে ; কিন্তু দেবতার বাসস্থান।"

"ইহা কি নরক তুল্য নর-রাজ্যের বহির্ভূত এস্থানে কি নর কুলাঙ্গারগণ আগমন করিতে পারে না।"

"না।"

এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন এমন সময় একটী মহা-তেজস্বী ব্রহ্মচারী সেইস্থানে উপনিত হইলেন, ব্রহ্মচারী আসিয়াই কামিনীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি গো এখন কিরূপ আছে ?"

"একটু ভাল।"

পাঠক আপনারা এই পীড়িতা যুবতীকে ও তেজস্বী ব্রহ্মচারীকে চিনিলেন কি ? যুবতী দেবী-বালা, ব্রাহ্মণ হরিদাস ভট্টাচার্য্য। যখন মরিতে স্থির সংকল্প করিয়া দেবী-বালা গঙ্গাবক্ষে লম্ফপ্রদান করিয়াছিল, তখন যে তাহাকে ধরিবার জন্য একটি ব্রাহ্মণ গঙ্গাবক্ষে সন্তরণ করিয়া যাইতে ছিলেন, তিনিই এই হরিদাস ভট্টাচার্য্য। একাদশীর উপবাস করিয়া রাত্রি সত্বেই হরিদাস ভট্টাচার্য্য প্রাতঃস্নান করিতে গঙ্গায় গমন করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে দেবী-বালার কাতরোক্তির সহিত গঙ্গায় লম্ফ প্রদান দর্শন করিয়া প্রাণপনে তাহাকে উদ্ধারের চেষ্টা করেন। ক্রমে তাহার চেষ্টা সফল হইল। তিনি দেবী-বালাকে উদ্ধার করিয়া নিজ আশ্রমে লইয়া গেলেন, তখন দেবী বালা অজ্ঞানের ন্যায় ছিল ; কাজেই তাহার সুশ্রুষার জন্য দুইটী পরিচারিকা নিযুক্ত করিয়া-ছিলেন, হরিদাস পরিচারিকাদের মুখে তাহার আরোগ্য সংবাদ শ্রবণ করিয়া আহ্লাদিত হইলেন ; এবং অনিমেষ নয়নে দেবী-বালার মুখপ্রতি তাকাইয়া কিছুকাল পর তিনি স্নেহরসে আদ্র হইলেন ; এবং বুঝিতে পারিলেন যে, ইতিপূর্ব্বে একবার ইহাকেই দস্যু হস্ত

হইতে উদ্ধার করিয়া বিষ্ণু-ঠাকুরের নিকট পাঠান হইয়াছিল; আহা! এই স্বর্ণ প্রতিমার পুনর্ব্বার এইরূপ অবস্থা কেন হইল? এইরূপ ভাবে চিন্তা করিতে করিতে হরিদাস ভট্টাচার্য্যের দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রুজল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল; এদিকে দেবী-বালাও হরিদাস ভট্টাচার্য্যের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নয়ন জলে বক্ষঃ ভাসাইতে লাগিল। উভয়ে এইরূপে কিছুকাল নির্ব্বাক হইয়া থাকিলে পর হরিদাস ভট্টাচার্য্য দেবী-বালাকে বলিলেন "কি মা আমাকে চিনিতে পারিয়াছ কি?"

"পিত! আপনাকে এ জন্মে ভুলিতে পারিব বলিয়া বিশ্বাস হয় না, দুঃখিনী বলিয়া যে, আপনার স্মরণ আছে ইহাই আমার নিতান্তই সৌভাগ্য।"

"যাহা হউক মা এখন আর সে সমস্ত কথায় প্রয়োজন নাই, এখন বল দেখি তুমি কি জন্য আত্মহত্যা করিতে উদ্যতা হইয়া গঙ্গায় নিমগ্না হইয়াছিলে?"

"পিত! এ দুঃখিনীর এ দুঃখময় পাপদেহ নরক তুল্য নররাজ্য হইতে অন্তর্হিত করিবার জন্যই চেষ্টা করিতেছিলাম; আপনি আবার তাহাতে বাঁধা দিলেন কেন?।"

"কেন মা! তোমার এরূপ দুঃখের কারণ তো কিছু দেখিতেছি না; তোমার শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামী সকলই বর্ত্তমান আছেন; তবে তোমার এরূপ মনোদুঃখের কারণ কি?"

"পিত! বিধাতা যার বিবাদী তাহার কিছুতেই সুখ হইতে পারে না; বিধান কর্ত্তা বিধাতা যে, আমাকে কেবল কষ্ট দেওয়ার জন্যই সৃজন করিয়াছেন; আমি চীর দুঃখিনী, সুখী হইব কিরূপে। নতুবা আমার সুখের সামগ্রীর কিছুরই অভাব ছিল না।

"তোমার কথার অর্থ যে আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, তবে কি আমি তোমাকে দস্যুহস্ত হইতে উদ্ধারের পর প্রেরণ করিলে তোমার শ্বশুর তোমায় গ্রহণ করেন নাই।"

"তিনি গ্রহণ করিবেন না কেন? বিধাতা বিবাদী হইয়া আর আমাকে নিজ গৃহে বাস করিতে দেন নাই, এ পর্য্যন্ত আমি নানা বিপদ অতিক্রম করিয়া পরগৃহে বাস করিতেছিলাম; তাহাতেও পদে পদে বিপদের আশঙ্কা দর্শন করিয়া অবশেষে এ পাপ পৃথিবী হইতে এ পাপ দেহ পরিত্যাগ করিবার জন্য পতিতোদ্ধারিণী জাহ্নবী-বক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম।" এই কয়েকটী কথা বলিতে বলিতে দেবী-বালার নয়নদ্বয় হইতে অশ্রুজল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল; তাহার চক্ষের জল দর্শন করিয়া হরিদাস ভট্টাচার্য্যও স্থির থাকিতে পারিলেন না; তাঁহারও নয়নদ্বয় বারি-পূর্ণ হইল, যেন নিদারুণ শোক বেগ উথলিয়া উঠিল; তখনকার সেই ভাব গোপন করিবার ইচ্ছা থাকিলেও পারিয়া উঠিলেন না, নয়নদ্বয়ই তাহার মনের ভাব প্রকাশ করিয়া দিতে লাগিল। তিনি অধৈর্য্য হইয়া বলিলেন "মা দেবী-বালা! তোমার ন্যায় সাধ্বী, সতী, সরলা যে সহজে নিজ-মুখে কাহার দোষ বলিবে না; আমি তাহা সবিশেষ জানি, কিন্তু এখন আর আমাকে ছলনা করিও না, এখন একে একে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা আমার নিকট ব্যক্ত কর।" দেবী-বালাও একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক একে একে যথাযথরূপে হরিদাস ভট্টাচার্য্য দস্যুহস্ত হইতে রক্ষা করিয়া শ্বশুরের নিকট প্রেরণ করাবধি যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সমস্ত প্রকাশ করিয়া বলিল। হরিদাস ভট্টাচার্য্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে বলিলেন" উঃ কি ভীষণ অত্যাচার, বঙ্গসমাজ এখনও

কেন অধঃপাতে যাইতেছে না। মূর্খ সহবাসের সুখ এত দিনে বিষ্ণু-ঠাকুর সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। শাকান্ন ভক্ষণ করিয়া ও বিদ্যান সাধু সঙ্গে বাস করা সর্ব্বোতোভাবে কর্ত্তব্য।" তিনি তখন মনেং এই সকল চিন্তা করিয়া দেবী-বালাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মা আর তোমার ভয় নাই; আমি তোমাকে সেই নৃসংশ রাক্ষস তুল্য নর সমাজে আর শীঘ্র পাঠাইব না; এখন তুমি কিছুদিন আমার এই আশ্রমে বাস কর; কিন্তু মা আমার কথানুযায়ী তোমার কয়েকটী কার্য্য করিতে হইবে। ইহাতে তুমি অমত প্রকাশ করিও না।"

দেবী। কি কার্য্য করিতে হইবে, আদেশ করুন, তাহা যত্নের সহিত পালন করিতে চেষ্টা করিব।

হরি। যখন যে কার্য্য করিতে হইবে তখনই তাহা শ্রবণ করিতে পারিবে; এখন কোন কার্য্যের জন্য উতলা হইও না, তুমি এই গৃহেই এখন অবস্থান কর। এই দুইটী রমণী তোমার সঙ্গিনী হইয়া থাকিবে; ইহারাও ব্রাহ্মণ কন্যা, ইহারা রন্ধনাদি করিলে তুমি অনায়াসে ভোজন করিতে পার, আর একটী পরিচারিকা পাঠাইতেছি, তাহা দ্বারা সমস্ত কার্য্য করাইয়া লইও; আর যদি কোন প্রয়োজন পড়ে তবে এই সঙ্কেত বংশীধ্বনি করিলেই আমি কি আমার অন্য কোন লোক এ স্থানে উপস্থিত হইবে। এই বলিয়া একটী বংশী প্রদান পূর্ব্বক হরিদাস ভট্টাচার্য্য প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। তখন দেবী-বালা বলিল; "পিত! আবার আপনার সাক্ষাৎ কখন পাইব।"

"অপরাহ্নেই আবার আসিব, আমি অধিকদূর যাইতেছি না; কাল একাদশী করিয়াছি. এখন সন্ধ্যা আহ্নিক করিয়া কিঞ্চিৎ

জলযোগ করিয়া আসি” এই বলিয়া হরিদাস ভট্টাচার্য্য প্রস্থান করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

সখি-সম্মিলন।

—:০:—

ক্রমে চারি পাঁচ দিবস গত হইয়া গেল। দেবী-বালা হরিদাস ভট্টাচার্য্যের সেই নিবিড় অরণ্য মধ্যের আশ্রমেই অবস্থিতি করিতেছে; সরলা, কমলা এবং বিরজা নামক তিনটী পরিচারিকা সহচরীর ন্যায় তাহার সহিত একত্র বাস করিতেছিল। দেবী-বালা হরিদাস ভট্টাচার্য্যের উপদেশ মত ঐ পরিচারিকাদের কথা মতই চলা ফেরা করিত। সরলা ও বিমলা দুইটীই যুবতী এবং পরম সুন্দরী ও সুশিক্ষিতা, উহাদের রূপ মাধুরীতে বনস্থল যেন আলোকিত করিয়া রাখিয়াছিল। ক্রমে দেবী-বালা উহাদের গুণ ও বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া দিনের দিন মনের দুঃখ সমস্ত যেন বিস্মৃত হইয়া তিনজনে পরস্পর প্রণয়পাশে দৃঢ়তররূপে আবদ্ধ হইতে লাগিল। বিরজা প্রৌঢ়া এবং ততধিক রূপবতীও নয়, বর্ণটী কাল, চোক দুটী বড় বড়; কিন্তু অতি বুদ্ধিমতি এবং কার্য্যক্ষম। সে নিজে সমস্ত গৃহকার্য্য সমাধা করিত, আর কাহাকে কোন কার্য্য করিতে দিত না; কিন্তু তাহা দেবী-বালার প্রাণে সহ্য হইত না, সে অনেক সময় বিরজার সাহায্য করিতে অগ্রসর হইত, কিন্তু চতুরা বিরজার সহিত পারিয়া উঠিত না। বিরজা কায়স্থ কাজেই রান্না করিতে

পারিত না, দেবী-বালা স্বয়ং পাক করিত, সরলা ও বিমলার তাহাতে হিংসা হইল, তাহারা বলিল "কেন আমরা কি এক দিনও রান্না করিতে পাইব না, রোজই তুমি রাঁধিবে; তবে আমরা আর এখানে কি কর্ম্মে আছি" দেবী-বালা হাসিয়া হাসিয়া বলিত "ভগ্নি! আমার রান্না কত্তে বড় সক; তোমরা কেন মিছে তাহাতে দুঃখ কর? এইরূপে দেবীবালার সহিত কেহই কথায় আটিতে পারিত না।

একদিন অপরাহ্নে বসিয়া তিনজনে নানাপ্রকার কথোপকথন হইতেছে। ইহার মধ্যে সরলা বলিল "ভগ্নি! বোধ হয় আমরা আর এ স্থানে অধিক দিন থাকিতে পারিব না।"

দেবীবালা নিতান্ত দুঃখিত অন্তঃকরণে বলিল "কেন?"

"আমরা তোমার পরিচারিকা, তুমি আমাদের কোন কাজ করিতে দেও না, কর্ত্তা আমাদের এখানে রাখিবেন কেন?

সরলার কথা শ্রবণ করিয়া দেবীবালা মনে মনে নিতান্ত দুঃখিতা হইয়া বলিল "ভগ্নি! তোমাদের এইরূপ উপহাস বাক্য আমার পক্ষে বড়ই হৃদয় বিদারক; আমাকে আর ঐরূপ নিষ্ঠুর বাক্য বলিয়া মর্ম্মাহত করিও না। তোমরা আমার সহচরী; তোমাদিগকে আমি সহোদরার ন্যায় বিবেচনা করি। এ স্থানে তোমাদের সহবাসে, যেরূপ সুখে কাল কর্ত্তন করিতেছি; আমার জন্মে আর কখনও এরূপ সুখানুভব করিয়াছি কি না সন্দেহ, অতএব তোমরা আর আমার এ সুখে বাধা দিও না। আর ইহাও নিশ্চয় জানিও জগতে কেহই কাহার চাকর চাকরাণী নয়। সেই বিশ্বস্রষ্টার নিকট সকলই সমান।"

সরলা মৃদুহাস্য করিয়া বলিল "ভগ্নি! তোমার ন্যায় বুদ্ধিমতী সরলা রমনীর মুখে এ কথা শোভা পায় বটে; যাহা হউক আর

তোমাকে ঐ সমস্ত কথা বলিয়া বিরক্ত করিতে ইচ্ছা করি না; তবে চীর জীবন যেন তোমার নিকট এইরূপ কৃপার পাত্রী থাকি, এইমাত্র আমাদের প্রার্থনা।”

এইরূপে উঁহারা কথোপকথন করিতেছে ইতিমধ্যে হরিদাস ভট্টাচার্য্য আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন; তাঁহাকে দর্শন করিয়া সকলেই গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সসম্ভ্রমে নমস্কার করিলে, তিনি উপবেশন করিয়া দেবীবালাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, “মা দেবীবালা তোমার শরীর এখন বেশ সুস্থ হ’য়েছে ত।

“আজ্ঞা হাঁ! এখন আমি বেশ আছি।

“তোমার মন সুস্থির হইয়াছে। এখানে অবস্থান করিতে আর তোমার কোন বিশেষ কষ্ট বোধ হয় না ত?

“পিত! এই স্বর্গতুল্য রাজ্যে কিন্নর কিন্নরীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থিতেও যাহার কষ্টানুভব হয়, তাহার আর কস্মিন কালেও শান্তিলাভ হইবে না। আমি এখন, আমার আশ্রয়দাতা পিতার গৃহে বেশ সুখ-সচ্ছন্দে আছি, আমার আর কিছুমাত্র কষ্ট নাই।

“মা! তোমার কথায় আমি সুখী হইলাম, এখন আমার কথানুযায়ী তোমার কয়েকটী কার্য্য করিতে হইবে। প্রথমতঃ তুমি তোমার পূর্ব্ব স্মৃতি সকল বিস্মৃত হইয়া যাও। আর তুমি শ্বশুর, শাশুড়ী ও স্বামীর কথা সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া হৃদয়ে দারুণ যাতনা ভোগ করিও না। সর্ব্বদা সরলা ও বিমলা এই সুশীলা বুদ্ধিমতী সহচরীদ্বয়ের সহিত যাহাতে তোমার বিপুল আনন্দানুভব হয় এইরূপ সমস্ত শাস্ত্রীয় কথার আলোচনা করিও। ইহারা দর্শনাদি নানাশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে। আমিও মধ্যে

মধ্যে আসিয়া তোমাকে শাস্ত্রীয় উপদেশ প্রদান করিয়া যাইব। আর এখনই অন্য একটী কামিনীকে তোমাদের এ স্থানে নিয়া আসিতেছি তাহাকেও সকলে ভগ্নীর ন্যায় যত্ন এবং শিক্ষা প্রদান করিও সে এস্থানে নূতন আসিয়াছে, তাহার প্রতি যেন যত্নের ত্রুটী না হয়।” এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। কিয়ৎকাল পর অপর একটী কামিনীকে সঙ্গে করিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ কামিনীকে দর্শন করিয়া দেবীবালা চঞ্চল হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিল, “ভগ্নি গিরিবালা! তুমি এখানে———

পাঠক আপনারা এই অপরিচিতা নূতন কামিনীকে চিনিলেন কি? এই আপনাদের সেই দেবীবালার বাল্য সখি গিরিবালা।

দেবীবালার কথা শুনিয়া চকিত হৃদয়ে গিরিবালা বলিল, “কেও বউ! দেবীবালা, তুমি জীবিত আছ? এত দিন আমাদের ভুলিয়া কোথায় কি ভাবে ছিলে! বল বল শীঘ্র বল, প্রাণ বড় উতলা হইয়াছে। আমি চীর দুঃখিনী তোমাকে পাইয়া অনেক দুঃখ বিস্মৃত হইয়াছিলাম। আবার অনন্ত দুঃখ সাগরে ভাসাইয়া তুমি চলিয়া গিয়াছিলে; এখন তোমাকে এস্থানে দর্শন করিয়া আবার সমস্ত দুঃখ ভুলিয়া যে কিপর্য্যন্ত আনন্দানুভব করিতেছি তাহা বলিতে পারি না।”

“ভগ্নি! আমার সে সমস্ত দুঃখ কাহিনী পরে বিস্তৃতরূপে তোমার নিকট প্রকাশ করিয়া মনের শান্তিলাভ করিব; এখন তুমি কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম কর।” এই বলিয়া স্নেহ পূর্ব্বক দেবীবালা গিরিবালার হস্তধারণ পূর্ব্বক বসাইল।

সেই স্থানের সকলেই উহাদের ঐরূপ অলৌকীক প্রণয় দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। হরিদাস ভট্টাচার্য্য উহাদের ঐ ভাব

দর্শন করিয়া পরমানন্দিত হইয়া বলিলেন, "মা! তবে আমি এখন আসি" এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন। হরিদাস ভট্টাচার্য্য চলিয়া গেলে, দেবীবালা গিরিবালার নিকট সমস্ত আত্ম বৃত্তান্ত বর্ণন পূর্ব্বক নয়ন জলে বক্ষ ভাসাইতে লাগিল। গিরিবালার নয়নও তাহার পরিশোধ করিবার জন্য দুই এক বিন্দু করিয়া অশ্রু পরিত্যাগ করিতে লাগিল। ক্রমে উভয়ের শোক বেগ কিঞ্চিৎ উপসম হইলে, গিরিবালা আবার স্বীয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে আরম্ভ করিল।— "ভগ্নি শিশুকালেই যে আমার কপাল পুড়িয়াছে তাহা তুমি জ্ঞাত আছ। জগতের মধ্যে এক জননীই আমার সমস্ত সুখের আধার ছিল। আজ এক মাস হইল জননী আমাকে অকুল সাগরে ভাসাইয়া" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই গিরিবালা আর বলিতে পারিল না। নিদারুণ শোক বেগ তাহার হৃদয়ে আসিয়া কণ্ঠরোধ করিল; নয়নদ্বয় হইতে অনর্গল ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হইয়া গণ্ডস্থল দিয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। অশ্রুজল নিতান্ত রসিক। সে অধিকাংশ সময়ই যুবতীর গণ্ডস্থলে আসিয়া হাজির হয়; কিন্তু তাহার রসিকতায় যুবতী হর্ষিতা হউক, আর নাই হউক, কিছু না কিছু শান্তিলাভ করিবেই করিবে। তাই অবলা কুলের শোকের সময় অশ্রুজল আসিয়া হাজির হইয়া তাহাদের শোক-বেগের লাঘবতা সম্পাদন করে।

গিরিবালার ঐরূপ ভাব দর্শন করিয়া দেবীবালা আর স্থির থাকিতে পারিল না। গিরিবালার সঙ্গে সঙ্গে তাহারও শোকবেগ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। গিরিবালার মাতৃ বিয়োগ সংবাদ শ্রবণে হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিল।

কিয়ৎকাল পর আবার গিরবিলা কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া বলিতে

লাগিল; "ভগ্নি! আমি মাতৃ বিয়োগের পর হইতে সংসারে একা হইলাম। একে শোকে অধীরা তাহার উপর আবার দারুণ আশঙ্কা। আশঙ্কা জীবনের নয়, জীবনের সার পদার্থ এই সতীত্ব রত্নটীর জন্য। ঘরে একা থাকিতে ভয় করে, কাজেই পাড়ার গোয়ালিনী দিদীকে আনিয়া রাত্রে গৃহে রাখিতাম এইরূপে দিন কয়েক গত হইলে পর এক দিবস হঠাৎ নিদ্রা ভঙ্গে উঠিয়া দর্শন করিলাম যে, দুইটী নরপশু আমার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আমার প্রতি অত্যাচারের পরামর্শ করিতেছে; ইহা দর্শন করিয়া আমি ভয়ে বিহ্বল হইয়া কাঁপিতে লাগিলাম। তখন মনে মনে সেই অনাথের নাথ দীনবন্ধু শ্রীহরির চরণ ভরসা করিয়া হৃদয়ে সাহস করিলাম এই অনর্থের মূল যে, সেই পাপীনী গোয়ালিনী; তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না; কারণ সে ও তখন স্থিরভাবে তাহাদের সহিত পরামর্শে নিযুক্তাছিল। আমার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে দর্শন করিয়া পাপীষ্ঠেরা তৎক্ষণাৎ আমার হাত ও মুখ বাঁধিয়া ফেলিল। আমি আর বৃথা চেষ্টা বিবেচনা করিয়া নির্জীব জড়-পদার্থের ন্যায় স্থির হইয়া রহিলাম; কিয়ৎকাল পর আমাকে এক শিবিকায় পূরিয়া অরণ্য পথ দিয়া নিয়া চলিল। এইরূপ ভাবে প্রায় একক্রোশ পথ অতিক্রম করিলে হঠাৎ ঐ পাপীষ্ঠদের সহিত অপর কোন ব্যক্তির ঘোরতর দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল বলিয়া আমার বিবেচনা হইতে লাগিল; কিয়ৎকাল পরই শিবিকা রাখিয়া বোধ হয় বাহকগণ পলায়ন করিল, আমি ভয়ে জড় সড় হইয়া প্রায় অজ্ঞানবৎ পড়িয়া রহিলাম; চৈতন্য হইলে পর সম্মুখে এই মহা পুরুষকে দর্শন করিলাম ইনি মাতৃ সম্বোধন করিয়া আমাকে আশ্বাস বাক্যে শান্ত্বনা করিতে লাগিলেন; এবং দস্যু-

হস্ত হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন আর কোন ভয়ের কারণ নাই বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। আমারও হৃদয় শান্ত হইল। পরে এই মহাপুরুষ আমাকে সঙ্গে করিয়া এই অরণ্য মধ্যে আসিয়া, আমার সমস্ত পরিচয় জ্ঞাত হইয়া অনেক দুঃখ প্রকাশ করিলেন; পরে তাঁহার অনুরোধে আহারাদি সমাপন পূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে ছিলাম, এমন সময় তোমার নিকট লইয়া আসিলেন, এখন ভগ্নি আমাকে সত্য বল দেখি ইহারা কি দেবতা না কোন পাপ কার্য্যের সাধক দস্যু।”

দেবী-বালা ঈষৎ হাঁসিয়া বলিল “ইহারা দস্যু নামে অভিহিত বটে; কিন্তু দেবতা; তোমার আমার আর কোন ভয়নাই। এখানে তোমার সহিত একত্র বাস করিয়া স্বর্গসুখ অনুভব করিব। সেই হইতে সরলা, বিমলা, দেবী-বালা, গিরিবালা এই চারিজনে একত্র পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিল। দিনের দিন উহাদের পরস্পর এইরূপ প্রণয় জন্মিল যে, কেহ কাহাকে ক্ষণ-কালের জন্য দর্শন না করিয়া থাকিতে পারিত না। সরলা ও বিমলা পূর্ব্বেই হরিদাস ভট্টাচার্য্যের নিকট দর্শনাদি নানা শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিল। এখন হরিদাস ভট্টাচার্য্যের আদেশ মতে, দেবী-বালা ও গিরিবালা আবার মুখে মুখে উহাদের নিকট সমস্ত শাস্ত্রীয় সুশিক্ষায় শিক্ষিতা হইতে লাগিল। প্রতি দিবস অপরাহ্ণে হরিদাস ভট্টাচার্য্য ও স্বয়ং উহাদের নিকট রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমৎভাগবত ও গীতার ব্যাখ্যা করিতেন; উহারা তাহার মর্ম্ম অবগত হইয়া সারাংশগুলি হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিত। এইরূপে সুচতুর হরিদাস ভট্টার্য্যের কৌশলে উহারা প্রত্যেকেই অল্পদিবস মধ্যে নানা শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিল।

একদিন অপরাহ্নে সরলা, বিমলা, গিরিবালা ও দেবী-বালা বসিয়া কঠিন দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা করিতেছিল; এমন সময় হরিদাস ভট্টাচার্য্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তাঁহাকে দর্শন করিয়া সকলে সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক নমস্কার করিলে তিনি প্রত্যেককে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক আসন পরিগ্রহ করিয়া, দেবীবালাকে বলিলেন "মা দেবী-বালা! আমি কিছু দিবসের নিমিত্ত স্থানান্তরে গমন করিব, তুমি আমার অনুপস্থিতকাল পর্য্যন্ত এ স্থানে অবস্থান করিতে কোন কষ্টানুভব করিবে না ত।"

দেবী-বালা তাঁহার এই কথা শ্রবণ করিয়া; দুঃখিতা হইয়া অধোবদনে রহিল আর কোন প্রত্যুত্তর করিতে পারিল না।

তাহার ভাব গতিক দেখিয়া হরিদাস ভট্টাচার্য্য বুঝিতে পারিলেন যে, এস্থানে তাঁহার অনুপস্থিতকাল পর্য্যন্ত দেবী-বালার থাকিতে কষ্ট হইবে। সে জন্যই পুনর্ব্বার বলিলেন "ইচ্ছা হইলে আমার সহিতও গমন করিতে পার?"

দেবী। কোথায়?

হরি। রাধা-নগর দেবী-রাণীর বাটী। দেবী-রাণী এক জন সন্ত্রান্তা অথচ সম্পত্তি-শালিনী রাণী, তাহার স্বভাব চরিত্র অতি পবিত্র; সে তোমাকে লইয়া তাহার বাটী গমন জন্য আমাকে অনেক সময় অনুরোধ করিয়াছে, যদি ইচ্ছা হয় তবে আমার সহিত তথায় গমন করিতে পার।

দেবী। আপনার সহিত রাধানগরে গমন করিতে পারিবটে কিন্তু সরলা, বিমলা ও গিরিবালাকে ছাড়িয়া যে কোথায় গমন করিতে মন উঠে না?

হরি। কেন? ইহারা ও সঙ্গে যাইবে।

দেবী। তবে আর অমত কি? আমি আপনার আজ্ঞায় ইহাদিগকে সঙ্গে করিয়া নরকে গমন করিতেও কষ্ট মনে করি না। আর ইহাদিগকে ছাড়িয়া স্বর্গীয় নন্দন-কাননে বাসও আমার সুখকর নয়।

"তবে প্রস্তত হও এখনি গমন করিতে হইবে।" এই বলিয়া হরিদাস ভট্টাচার্য্য প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

রাধানগরে দেবীরাণী।

প্রায় সন্ধ্যা আগতা। এখনও ভগবান মরিচীমালী অস্তগিরি শিখরে আরোহণ করেন নাই। এখনও পশ্চিম গগনে অল্প অল্প করবর্ষণ করিয়া প্রকৃতি-সতীর অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছেন, পবনদেব অতি মৃদু মধুর গতিতে সমভাবে সকলকে শান্তি-সুখ প্রদান করিতেছেন। গঙ্গাবক্ষের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গমালা; হেলিতে দুলিতে হাসিতে হাসিতে মায়ের কোলে মিশিয়া যাই-তেছে। তপন-দেবের রশ্মিজাল পতিতে আজ তরঙ্গিনী বড়ই শোভা বিস্তার করিতেছিল। যেন রাশী রাশী সুবর্ণালঙ্কারে ভূষিতা যুবতী সাহঙ্কারে আপনার রূপের জ্যোতি বিস্তার পূর্ব্বক নাগর অন্বেষণে গমন করিতেছে। অপরাহ্নের বায়ু সেবনার্থ বালক, বৃদ্ধ, যুবক অনেকেই গঙ্গাতীরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। গঙ্গার পশ্চিম পার রাধ-নগরে দেবীরাণীর বাটী—বাড়ীটী নূতন তৈয়ারী; এই বাটীতে নির্ম্মাণ কর্ত্তা অনেক শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন। গঙ্গা গর্ভের অতি সন্নিকটেই দেবী-রাণীর বাটীর কারুকার্য্য খচিত উন্নত সৌধমালা শোভা বিস্তার করিতেছিল। ঐ বাটী সংলগ্ন ইষ্টক নির্ম্মিত সোপান

শ্রেণী গঙ্গাগর্ভ পর্য্যন্ত গমন করিয়া নিম্নস্থ থাক গঙ্গার পুণ্য বারিতে অঙ্গ ডুবাইয়া আছে। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, নিম্ন না হইলে আর উচ্চপদ পাওয়া যায় না।

ঐ শোপান শ্রেণীর সন্নিকটে একখানা কারুকার্য্য খচিত বজরা আসিয়া লাগিল। বজরা ঘাটে লাগিবামাত্র তাড়াতাড়ি আমলা, গোমস্তা, দ্বারওয়ান প্রভৃতি অনেক লোক জন আসিয়া ঘাটে উপস্থিত হইল। সকলেই যেন বজরা উদ্দেশ্য নমস্কার করিতে লাগিল; পাঠক বলুন দেখি এ বজরায় কে আছে। সকলেই বলিবেন রাধানগরের কর্ত্রী দেবী-রাণী; কিন্তু আমরা এখনও বলিব সেই চীর দুঃখিনী ভিখারিণী দেবী-বালা।

ক্রমে চারিখানা শিবিকা আসিয়া বজরার সম্মুকে উপস্থিত হইল, তন্মধ্যে একখানা শিবিকার অলৌকিক কারুকার্য্যে বিশ্বনিয়ন্তার স্বষ্টির অপূর্ব্ব মহিমা বিস্তার করিতেছিল। ক্রমে একটি তেজস্বী ব্রাহ্মণ বজরার মধ্য হইতে বাহির হইয়া বলিলেন "মা! তোমরা সকলে বাহিরে এস।" ক্রমে অপ্সরা বিনিন্দিত চারিটী যুবতী বাহির হইল। পাঠক এখন আপনারা ইহাদিগকে চিনিলেন কি? ব্রাহ্মণ আপনাদের সেই হরিদাস ভট্টাচার্য্য; আর রমণী চতুষ্টয় তাহার প্রতিপালিতা সরলা, বিমলা, দেবীবালা ও গিরিবালা। হরিদাস ভট্টাচার্য্য দেবীবালাকে দেবীরাণীর সহিত সাক্ষাৎ করাইবেন বলিয়া নিয়া আসিয়াছেন।

হরিদাস ভট্টাচার্য্যের অনুমতি ক্রমে উহারা একে একে শিবিকায় আরোহণ করিল। বাহকগণ তৎক্ষণাৎ নিয়া চলিল। দেবীবালা কারুকার্য্য খচিত শিবিকায় আরোহণ করিয়া শিবিকার শিল্পনৈপুণ্য দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যাম্বিত হইল। এবং মনে মনে চিন্তা

করিতে লাগিল যে,দেবী-রাণী আমাকে এতযত্ন করেন কেন ? দেবী-বালা শিবিকার অভ্যন্তর হইতে গুপ্তভাবে দেবীরাণীর বাটীর অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করিতেছিল ; তাহার শিবিকার অগ্র পশ্চাৎ অনেক প্রহরী নিযুক্ত আছে দর্শন করিয়া তাহার মনের ভিতর নানাপ্রকার সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইল, সে বিবেচনা করিল তবে কি আমি বন্দি ; পালাইব ভয়ে এত প্রহরী নিযুক্ত হইয়াছে। ক্রমে দেউড়ীতে আসিয়া শিবিকা উপস্থিত হইল ; দ্বারবানগণ ও অন্যান্য লোক জন কর্ম্মচারী সকলেই যেন ঐ শিবিকা উদ্দেশ্যে অভিবাদন করিতে লাগিল ; ইহাতে দেবী-বালার অন্তরে আরও বিষম সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইল। বাহকগণ অন্তপুরমধ্যে শিবিকা লইয়া গেলেপর ; একটি পরিচারিকা শিবিকার দ্বার উন্মোচন করিয়া বলিল "বাহিরে আসুন।" দেবী-বালা শিবিকা হইতে অবতরণ করিলেন, পরিচারিকা তাহাকে নিয়া একটি প্রকোষ্টে গমন করিল। সেই প্রকোষ্ঠের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে বিশ্বনিয়ন্তার অসাধারণ মহিমা প্রকাশ পাইতেছিল। ভিত্তিটী শ্বেতপ্রস্তর-দ্বারা গ্রথিত, দেওয়ালের গায় নানাবিধ হীরা, মুক্তা প্রভৃতি রত্নসমূহ শোভা বিস্তার করিতেছে এবং নানাবিধ দেব দেবীর ছবি চিত্রকরের চিত্রবিদ্যার সবিশেষ পরিচয় প্রদান করিতেছিল, ঝাড়, লণ্ঠন, আরও নানাবিধ আসবাব যথাস্থানে রহিয়াছে ; প্রকোষ্ঠে যেন কিছুরই অভাব নাই। যেখানে যাহা শোভা পায় সে স্থানে তাহা সাজান রহিয়াছে, যেন ইন্দ্রের অমরাপুরী। এসবদিকে দেবীবালার লক্ষ্য নাই। তাহার হৃদয়ে এক বিষম ভয় ও ভাবনা আসিয়া অধিকার করিয়াছে সেই সুন্দর ঢলঢলে মুখখানাতে যেন বিষাদেরছায়া আসিয়া পতিতহইয়াছে। সে

ভাবিতেছে আমাকে ইহারা এই স্বর্ণপিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া রাখিল; কেন?এ সময় সেই সরলা, বিমলা গিরিবালাইবা কোথায়। তাহাদিগকে ছাড়িয়া এক দণ্ড অবস্থান করিতে ও আমার সহস্র বৃশ্চিক দংশন যাতনা অপেক্ষা অধিক যাতনা বোধ হয়; বিশেষতঃ এই কারাগারে। আর দেবীরাণীইবা আমাকে এত যাতনা দিতেছেন কেন? তাঁহার কি কোন দুরভিসন্ধি আছে; এইরূপ নানাবিধ দুশ্চিন্তায় তাহার মুখ মলিন হইয়া উঠিতেছিল; কপোলদেশ হইতে বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরিতেছে। দুই জন পরিচারিকা নিয়ত বাতাস করিয়াও তাহার ঘর্ম্ম নিবারণ করিতে পারিতেছে না। প্রায় এক ঘণ্টা কাল অতিত হইল কাহার মুখে কোন কথা নাই প্রকোষ্ঠ নিস্তব্ধ। দেবীবালা চিন্তায় বিব্রত। পরিচারিকা আজ্ঞা প্রতিপালন জন্য তাহার মুখাবলোকন করিয়া রহিয়াছে; দেবীবালা আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না; পরিচারিকাকে বলিল "আমার সহিত যে আর তিনটী রমণী আসিয়াছে তাঁহারা কোথায়?"

" আজ্ঞা বলিতে পারিনা; অনুমতি হয়ত অনুসন্ধান করিয়া আসি?"

"যাও দেখিয়া এস আর কোন বাঁধা না থাকিলে এখানে একবার আসিতে বলিও" " যে আজ্ঞা" বলিয়া এক জন পরিচারিকা প্রস্থান করিল।

দেবীবালা আপন মনে বসিয়া চিন্তায় নিযুক্তা হইল। আবার ভাবিতে লাগিল এ সময়ে আমার আশ্রয় দাতা পিতা হরিদাস ভট্টাচার্য্যইবা কোথায় গেলেন। এইরূপে চিন্তা করিতেছে এমন সময়

পরিচারিকা ফিরিয়া আসিয়া বলিল "তাঁহারা অন্য প্রকোষ্ঠে আছেন এখনি এ স্থানে আগমন করিবেন।" কিয়ৎকাল পর হাঁসিতে হাঁসিতে হেলিতে দুলিতে আহ্লাদে আটখানা হইয়া; সরলা, বিমলা, ও গিরিবালা আসিয়া সেই প্রকোষ্ঠে উপস্থিতা হইল। তাহাদের এই ভাব দর্শন করিয়া দেবীবালা আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইল; উহাদের এতাধিক আনন্দের কারণ কিছুই অনুধাবন করিতে না পারিয়া বিস্মৃত চিত্তে বিস্ফারিত নেত্রে উহাদের মুখপ্রতি তাকাইয়া রহিল। সরলা হাঁসিতে হাঁসিতে বলিল "ভাল আছেন তো রাণী মা!" সরলার কথা শ্রবণ করিয়া দেবী-বালার নিতান্ত রাগ হইল, সে দুঃখিত অন্তরে বলিল "ভগ্নি! সরলা! এই কি ভালবাসার প্রতিদান। তোমরা আমাকে এই কারাগার সম নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে রাখিয়ে কোথায় গিয়েছিলে, যদি বা এখন এলে তাহাতে আবার উপহাস করিতেছে; আমি যে, তোমাদের বিরহে এ পর্য্যন্ত কি ভাবে কাল কর্ত্তন করিয়াছি তাহা আমার অন্তরাত্মা ভিন্ন আর কেহই জানেনা।

সরলা। কেন? এ দাসীরাতো চীরদিনই আপনার পদানত, আপনার হুকুমের অন্যথাচরণ করি আমাদের এমন সাধ্য কি?

দেবী। তোমাদের এ সমস্ত কথার ভাব আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছিনা! তোমরা কি বারম্বার আমাকে পরিহাস পূর্ব্বক কেবল গঞ্জনা দিবে? এখন কি পরিহাসের সময়। কোথায় দেবী-রাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দুদণ্ড তাহার সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া মনের শান্তি করিব। এ দেখিতেছি তাহার বিপরীত। এ সময় পিতা হরিদাস ভট্টাচার্য্যইবা কোথায় গেলেন।

দেবীবালার কথা শ্রবণ করিয়া উহারা তিন জনেই হাঁসিয়া বিভোর; দেবীবালা উহাদের মনের ভাব কিছু মাত্র বুঝিতে না পারিয় মনে মনে নিতান্তই দুঃখিত হইয়া। উহাদের সহিত আর কোন বাক্যালাপ না করিয়া নিরবে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। এমন সময় হরিদাস ভট্টাচার্য্য আসিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন, তাহাকে দর্শন করিয়া সকলেই সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক নমস্কার করিল দেবীবালা ও নমস্কার করিয়া বিনিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল "পিতঃ! আমি ইহাদের কথা বার্ত্তার ভাব কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বড়ই অধীর হইয়া পড়িয়াছি। দেবীরাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি তাহার কি দর্শন পাইব না?

হরিদাস। মা! আমি যে তোমার নিকট দেবীরাণীর কথা বলিয়াছিলাম। সেই দেবীরাণী নামে অন্য আর কেহ নাই। এই বাটী ঘর সমস্ত সম্পত্তিই আমার, আমি তোমার জন্য এ সমস্তই দেবীরাণীর নামে খরিদ করিয়াছি। অদ্য হইতে আমি তোমাকেই দেবীরাণী নামে অভিহিত করিয়া এ সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী করিলাম। অদ্য হইতে তুমি আমার কথানুযায়ী ন্যায় পথে থাকিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক এই সমস্ত বিষয় ভোগ কর। আমি কেবল তোমার প্রতিপালক পিতা এমন নহি আমিই তোমার জন্মদাতা জনক, আমিই সেই নির্দ্দয় গোবিন্দ রায়। তুমি এত দিবস পর্য্যন্ত আমাকে চিনিতে পার নাই, কিন্তু আমি তোমাকে দর্শন মাত্রই চিনিয়াছিলাম; সেই হইতেই আমার কন্যা-স্নেহরসে মন আর্দ্র হইয়াছিল। ইহ জগতে আমার আর কেহই নাই। পুত্র শোকে অধীর হইয়াই আমি গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। পুত্র বিরহেই আমি এত দিন সংসার পরিত্যাগ

পূর্ব্বক বনে বনে ঘুড়িয়া কাল কাটাইয়াছি, আর সংসারের মায়ায় আবদ্ধ হইব না বলিয়াই স্থির সঙ্কল্প করিয়া ছিলাম; কিন্তু মা তোমার দুরবস্থা দর্শন করিয়া আমার হৃদয়ে আবার স্নেহ-রসের আবির্ভাব হয়। পুনর্ব্বার বিষয়কার্য্যে লিপ্ত হইয়া কৌশল পূর্ব্বক এই সমস্ত সম্পত্তি তোমার নামে করিয়াছি। পাপার পাপের ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়। পাপকার্য্য করিয়া মানবচক্ষে ধূলী নিক্ষেপ পূর্ব্বক ত্রাণ পাইলেও সেই বিশ্ব নিয়ন্তার নিকট কিছুতেই পরিত্রাণ পাওয়া যায়না তিনি পাপীর শাস্তি-বিধান না করিয়া কিছুতেই ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না। চন্দ্ররায় নিতান্ত নিষ্ঠুর ও নির্দয়ছিল,পাপকার্য্য করিতে কিছুইমাত্র কুণ্ঠিত হইত না, আমাকে সংসার-বিরাগী করিবার এক-মাত্র কারণ ও সেই দুরাচার সেই পাষণ্ডই প্রাণপুত্র সতীশকে চির নির্ব্বাসন তোমাকেও অকুল দুঃখ সাগরে ভাসাইতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিল। কেবল স্বীয় পুণ্যবলেই তুমি রক্ষা পাইয়াছ। এই সমস্ত পাপকার্য্যের অনুষ্ঠানেরপর বিশ্বনিয়ন্তার কৌশল ক্রমে পাপীষ্ঠ ভয়ানক বিপদজালে জড়িত হইয়া ইংরেজ করাগারে অশেষ যাতনা ভোগ করিতেছিল, আমি তাহার সমস্ত সম্পত্তি দেবীরাণীর নামে লিখিয়া লইয়া কৌশল ক্রমে তাহাকে মুক্ত করিয়াছি।"

দেবীবালা হরিদাসভট্টাচার্য্যের এই সমস্ত কথা শ্রবণ পূর্ব্বক তাহাকে জন্মদাতা পিতা বলিয়া জানিতে পারিয়া হর্ষ ও বিষাদে অধীরা হইয়া হতবুদ্ধির ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার পদমূলে পতিত হইয়া বলিল ' পিতঃ আপনি জীবিত আছেন এতদিন আমা-দিগকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় ছিলেন।" তিনি বলিলেন "মা দেবীবালা! প্রথমতঃ আমি গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে প্রাণ পুত্র সতীশের অন্বেষণ করিয়া বিফল মনোরথ হইলে, সংসারের

রায়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনে বনে ঘুড়িয়া বেড়াইতে ছিলাম। হঠাৎ একদিবস আমি, বীরচাঁদ দস্যুদল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলাম অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া তাহাদের নিকট জীবন ভিক্ষা চাহিলাম; কিন্তু নৃসংশ দস্যুগণ আমার প্রার্থনায় কর্ণপাত না করিয়া, ভবানীর নিকট বলি প্রদান জন্য আমাকে বন্ধন করিয়া রাখিল। দুইদিবস কাল ঐরূপ বন্ধন অবস্থায় থাকিলে; দস্যুদের দলপতি বীরচাঁদ সরদার আমাকে দর্শন করিতে আসিয়া আমার প্রতি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার বন্ধন মুক্ত করিলএবং বলিল " ভবানীর কৃপায় আপনি জীবন পাইলেন; এখন আপনি আমাদের এই দস্যুদলের মধ্যে একজন দস্যুরূপে পরিণত হইয়া আমাদের কার্য্যে নিযুক্ত হউন; কিন্তু ভবানীর নিকট আপনার একটি প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে এই যে, আপনি কখনও আমাদের বিপক্ষতাচরণ করিতে পারিবেন না। আমি দস্যুপতির এইরূপ দয়া প্রকাশের কারণ অনুধাবণ করিতে না পারিয়া মনে মনে নিতান্তই আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। আমি দস্যুপতির কথা মত প্রতিজ্ঞা করিয়া দস্যুদলভুক্ত হইলাম। ক্রমে আমার কার্য্য কলাপ দর্শন করিয়া দস্যুপতি আমার প্রতি সম্মান প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমি দস্যুদলে প্রবেশ অবধি আর বীরচাঁদ দস্যুদলের ডাকাতিতে নরহত্যা হয় নাই। ক্রমে আমার কৌশলপূর্ণ উপদেশে দস্যুগণ সমস্তই পরম ধার্ম্মিক হইয়া উঠিতে লাগিল, আমি ও দলের মধ্যে ক্রমশই প্রাধান্যতা লাভ করিতে লাগিলাম। আমি সদুপায় দ্বারা ইহাদের রাশি২ অর্থ সঞ্চয়ের পথ বলিয়া দেওয়াতে আর কেহই অন্যায় আচরণ করিত না; পরে আমি দলের কর্ত্তা হইলাম। আমার অনুমতি ভিন্ন কেহই কোন কাজ করিত না। আমি নিয়ত উহা-

দিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া প্রত্যেককেই পরম ধার্ম্মিক করিয়া তুলিলাম। আমার কৌশলপূর্ণ কার্য্যকলাপ দর্শন করিয়া অনেকেরই আমাকে দেবতা বলিয়া বিশ্বাস ছিল। তখন আমরা যদিচ দস্যুর ন্যায় কোন কাজ করিতামনা; তথাপিও আমাদের দলকে বীরচাঁদ দস্যুদল বলিয়াই প্রবাদ ছিল; সকলেই আমাদের নামে তটস্থ ভয়ে ছিল। ইংরেজের রাজ্য শাসনের প্রথমাবস্থায় দুর্ভিক্ষের ভীষণ পরাক্রমেই এই দস্যুদলের সৃষ্টি হয়। আমি অনেক কৌশলে রাজ্যের সুবন্দোবস্ত অরণ্য মধ্যে দস্যুনামে অভিহিত হইয়া একরূপ রাজ্যশাসন করিয়া আসিতে ছিলাম। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনই আমাদের কার্য্য ছিল। যে কয়েকটী স্ত্রীলোক আমার আশ্রম দর্শন করিয়া ছিল, ঐ সমস্তই বিপদাক্রান্তা হইয়া ছিল; আমি ইহাদিগের অনন্যোপায় দর্শন করিয়া নিজ আশ্রমে যত্নপূর্ব্বক প্রতিপালন করিতে ছিলাম। এইরূপ অনেক বিপন্ন পুরুষকেও আমি উদ্ধার করিয়াছি। তোমার পিতাকে কেবল পাপকার্য্যের সাধক দস্যু বলিয়া মনে মনে ঘৃণা করিওনা এবং এই সমস্ত বিষয় গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইও না। মা দেবীবালা এজগতে আর আমার বলিতে কেহ রহিলনা। এখন তুমি একমাত্র ভরসা এ সমস্তই তোমার জন্য করিয়াছি। তুমি রীতি মত ভোগ করিলেই আমি সুখী হইব। দেখিও একেবারে ভুলিয়া যাইওনা। অর্থই অনর্থের মূল; কেবল অর্থের জন্যই তুমি এপর্য্যন্ত এরূপ কষ্টভোগ করিয়া আসিয়াছ। আমি তোমাকে শিশুকালে দরিদ্রের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলাম; এজন্যই এখন আবার তোমাকে বিপুল ধনের অধিকারিণী করিলাম। তুমি সুখে আছ ইহা দর্শন করিলেই আমার জীবন সার্থক

হইবে। আজ হইতে আমি এ সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলাম। আজ হইতেই বীরচাঁদ দস্যুদলের নাম পৃথিবী হইতে লোপ হইল। এখন দু চারি দিন তোমাদের সুখ-ভোগ দর্শন করিয়া, আমি দৃষ্টান্তকরণে কাশীবাসী হইব। আমি কৌশল করিয়া পূর্ব্বেই এস্থানে জামাতা প্রবোধ ও তোমার শ্বশুর শাশুড়ীকে আনয়ন করিয়াছি। তজ্জন্য আর কোন চিন্তা করিওনা।"

দেবীবালা হরিদাস ভট্টাচার্য্যের সমস্ত কথা শ্রবণ পূর্ব্বক হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে তাহার চরণ ধারণ পূর্ব্বক কাঁদিয়া বলিল " পিতঃ বহুদিন পর জন্মদাতা পিতাকে পাইলাম ; আপনার কৃপায় শ্বশুর শাশুড়ী সমস্ত পাইব ; কিন্তু দুঃখিনী জননী ও প্রাণের ভাই সতীশকে কি আর দেখিতে পাইবনা ?"

মা। আর সে জন্য দুঃখ করা বৃথা, সমস্তই জগৎপাতা জগদীশের ইচ্ছা ; তিনি ইচ্ছা করিলে সমস্তই হইতে পারে। এখন তুমি তোমার সহচরী দিগেরসহিত কথোপকথন কর আমি একবার বাহির হইতে আসি " এই বলিয়া হরিদাস ভট্টাচার্য্য প্রস্থান করিলেন। দেবীবালাও সহচরীগণের সহিত নানাবিধ কথোপকথনে কাল কাটাইতে লাগিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

স্বামী সম্মিলন।

বেলা প্রায় একপ্রহর হইয়াছে ; সকলেই স্বীয় স্বীয় কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। রাধানগরের দেবীরাণীর বাটীর আমলাগণ রাশি রাশি কাগজপত্র লইয়া আপন মনে কার্য্য করিতেছে। একটি নূতন নায়েব কতকগুলি কাগজ পত্র লইয়া অন্তঃপুরের দিক অগ্রসর হইতেছেন. তাহার অগ্রে অগ্রে একটি পরিচারিকা পথ প্রদর্শক রূপে গমন করিতেছে। অন্তঃপুর দ্বারের নিকট গমন করিলে, প্রহরীর ভীষণ দৃষ্টিতে তাহার অন্তরে ভয়ের আবির্ভাব হইল, সে স্তম্ভিতভাবে একপার্শ্বে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া রহিল। পরিচারিকা তাহার এই ভাব দর্শন করিয়া বলিল আপনি কোন ভয় করিবেন না, নিঃশঙ্কচিত্তে আমার সহিত আসুন।

“আমাকে কোথায় যে’তে হবে”

“রাণীমার নিকট”

“কেন”

“আমি বলিতে পারিনা”

নায়েব একথার উপর আর কোন দ্বিরুক্তি না করিয়া পরি-

চারিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। ক্রমে উহারা অন্তঃপুরের অনেক প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করিয়া এক সোপান শ্রেণীর উপর দিয়া নানাবিধ কারু কার্য্য খচিত অপর প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইল। নূতন নায়েব ঐ প্রকোষ্ঠের অপরিসীম কারুকার্য্য দর্শন করিয়া বিস্ময়ান্বিত হইল। প্রকোষ্ঠ মধ্যে তিনটী অলোক সামান্যা রূপবতী কামিনী নানাবিধ অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া বিরাজ করিতেছিল। নূতন নায়েব রমণীত্রয়কে দর্শন করিয়া বিষম সমস্যায় পড়িলেন, উহাদের মধ্যে যে, কে দেবীরাণী, কাহাকে উপযুক্ত সম্মান করিবেন, কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছেন না। ভাবনায় চিন্তায় মুখশুষ্ক হইয়া গিয়াছে, প্রাণ ছট্ ফট্ করিতেছে। কি জন্য যে, একটা সামান্য ভৃত্যকে দেবীরাণী নিজ অন্তঃপুরে আনয়ন করিলেন; তাহার মনের অভিপ্রায় যে কি কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। যে কখনও অন্দরের বাহির হয়না; যাঁহার ছায়া পর্য্যন্ত কখন অন্য পুরুষে দর্শন করিতে পারেনা; তিনি কেন যে, এই অপরিচিত সামান্য ভৃত্যকে নিজের নিকট আনয়ন করিলেন,—তবে কি ইহার কোন গুঢ় দুষ্টাভিসন্ধি আছে? এইরূপ চিন্তাতরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে অধীর হইয়া পড়িল।

পাঠক আপনারা এই নূতন নায়েবকে চিনিলেন কি, বোধ হয় ইহার প্রকৃত নাম জ্ঞাত হইলে আর চিনিতে বিলম্ব হইবে না? ইহার নাম প্রবোধচন্দ্র। দরিদ্র বিষ্ণুঠাকুরের পুত্র হরিদাস ভট্টাচার্য্যই ইহাকে দেবীরাণীর বাড়ীতে নায়েবী পদে নিযুক্ত করিয়াছেন, এখন অবশ্যই আপনারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে; আজ প্রবোধকে কি অভিপ্রায়ে অন্তঃপুরে আনয়ন করা হইয়াছে।

প্রবোধচন্দ্র প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া, চিন্তা করিতেছিলেন, ইতি মধ্যে ঐ রমণীত্রয়ের একটি তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "আপনি কোন ভয় করিবেন না এখানে আমরা তিনটী রমণী ভিন্ন আর কেহ নাই।

রমণীর কথায় প্রবোধ মনে মনে একটু হাঁসিয়া বলিল আমি "আপনাদের চাকর আপনাদিগকে ভয় করিবনা কেন?

রমণীত্রয় হাঁসির লহর তুলিয়া পরে একজন একটু গম্ভীর ভাবে একজ মবলিল চাকরে আজ্ঞা প্রতি পালন করিবে? তবে কথানুযায়ী কাজ করিতেছেন না কেন?"

"এখন আমাকে কি কার্য্য করিতে হইবে অনুমতি করুণ"

"আমাদের কর্ত্রী দেবীরাণীর একটি অনুরোধ রক্ষা করিতে হইবে।"

"সে অবশ্যই সাধ্যাতীত না হইলে প্রতিপালন করিব।".

"আপনি সৎবংশ-জাত এবং কুলীন; দেবীরাণীর একটী অবিবাহিতা ভগ্নী আছে, তাহাকে পরিণয় করিয়া আমাদের দেবী-রাণীর মান রক্ষা করুণ ইহাই তাঁহার অনুরোধ।"

বিবাহের কথা শ্রবণ করিয়া প্রবোধের মুখ রক্তিমবর্ণ হইল নয়নদ্বয় হইতে যেন বহুদিনের জমাট শোকাশ্রু গলিয়া পড়িতে লাগিল। তাঁহার এই ভাব দর্শন করিয়া একটি রমণী বলিল "বিবাহের কথা শ্রবণ মাত্র আপনার এইরূপ ভাবের ব্যতিক্রম দর্শন করিতেছি কেন? আপনি কি পূর্ব্বেই কোন অবলার প্রেমে আবদ্ধ হইয়াছেন।"

"সে অনেক কথা; আর সে কাহিনী উল্লেখ করিয়া

আমার পূর্ব্ব স্মৃতির উত্তেজনা করিয়া মনে কষ্ট প্রদান করিবেননা।”

“বুঝিয়াছি আপনি সেই রূপবতীর রূপে মজিয়া ছিলেন; কিন্তু এখন কি তিনি জীবিত নাই।” কামিনীর এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রবোধের চক্ষে জল আসিল, সে দুঃখিত অন্তরে বলিল “আপনারা আমায় ক্ষমা করুন, আমার সে সমস্ত দুঃখ কাহিনী উত্থাপন করিয়া আর কেন মিছে মনে কষ্ট দিতেছেন, এখন আমাকে এস্থানে যে জন্য আনয়ন করিয়াছেন তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন”

“আপনাকে এজন্যই এস্থানে আনয়ন করা হইয়াছে, দেবী-রাণীর ভগ্নীকে আপনার বিবাহ করিতে হইবে।”

“আমাকে ওকথা আর বলিবেন না, আমার বিবাহের সাধ জন্মের মত ফুরাইয়াছে।”

“আপনার পরিনীতা সুন্দরীর জন্য অবশ্যই আপনার কষ্ট হইতে পারে, কিন্তু যদি সেইরূপ অন্য কোন রূপবতী কামিনীকে পরিণয় করেন তাহা হইলে অবশ্যই মনের শান্তি হ'তে পারে।”

“শান্তি! ইহ জন্মে আর আমার শান্তি হইবে না।”

একটি কামিনী হাঁসিতে হাঁসিতে বলিল, “আপনি এই প্রকোষ্টে গমন করিয়া দেখুন দেখি শান্তি হয় কি না।”

“এই নর-রাজ্যের মধ্যে আমার আর শান্তির স্থান নাই। যদি ইন্দ্রের অমরাবতী তুল্য স্থানে সহস্র সহস্র পারিজাত কুসুম বনে ভ্রমণ করি তথাপি আমার তাপিত প্রাণ শীতল হয় কিনা সন্দেহ, আমি যে পবিত্র বস্তু হারা হইয়াছি তাহার অভাবে আমার হৃদয়

মধ্যে বিচ্ছেদানল দিবা নিশি ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে; সে অগ্নি কি আর নির্ব্বাণ হইবে?"

"অবশ্য হইবে? বিশ্বাস না হয় আমার সহিত গমন করিয়া প্রত্যক্ষ করুন" এই বলিয়া একটি কামিনী তাহার হস্ত-ধারণ করিয়া অপর প্রকোষ্ঠে লইয়া গেল। প্রকোষ্ঠের অলৌকিক সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া প্রবোধ আশ্চর্য্যান্বিত হইল। তাঁহার নয়ন চকোর প্রকোষ্ঠের সৌন্দর্য্যসুধা পান করিতে করিতে হঠাৎ একস্থানে নির্নিমেষ ভাবে স্থির হইল; তথায় সৌন্দর্য্যের খনি স্বরূপ এক অবগুণ্ঠনবতী ষোড়শী কামিনী দক্ষিণ হস্তের উপর গণ্ডস্থল ন্যাস্ত করিয়া বিষম চিন্তায় নিযুক্ত। উভয়ের চোখে চোখে মিলন হওয়াতে উভয়েই জ্ঞান হারা। যেন পরস্পর পরস্পরের নয়ন বাণে বিদ্ধ হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে।

কিয়ৎকাল পর প্রবোধ চৈতন্যলাভ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। "একি স্বপ্নদর্শন করিতেছি? না কোন মায়াবিনীর মায়া? প্রকৃতইকি আমার প্রাণের দেবীবালা জীবিত আছে?"

"আছে! এ অভাগিনীর জীবন কেবল ঐ চরণ যুগল দর্শন করিবার আশাই এখন পর্য্যন্ত এই দেহপিঞ্জরে অবস্থিতি করি-তেছে। আর অভাগিনীকে চরণ ছাড়া করিওনা" এই বলিয়া গৃহস্থিতা রূপবতী ছিন্নলতার ন্যায় তাহার পদমূলে আসিয়া পড়িল। "প্রিয়ে দেবীবালা তুমি জীবিত আছ?" "বাহির হইতে একটি কামিনী বলিল "আর আপনার দেবীবালা নাই, ইনি দেবীরাণী।" ক্রমে দেবীরাণীর সহিত প্রবোধের পরিচয় হইল। দেবীবালার দুঃখ কাহিনী শ্রবণ করিয়া প্রবোধ নিতান্তই

দুঃখিত হইলেন। আজ বহুদিন পর উভয়ের বিচ্ছেদাগ্নি নির্ব্বাপিত হইল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

নবীন সন্ন্যাসী।

—•ஃ•—

বৈশাখ মাস! বেলাপ্রায় দুইপ্রহর, মার্ত্তণ্ড-দেব গগণ মণ্ডলের ঠিক মধ্যস্থলে উপনীত হইয়া প্রবল প্রতাপের সহিত নিজ মহিমা বিস্তার করিতেছেন; রোদ খাঁ খাঁ করিতেছে; সূর্য্য কিরণে পৃথিবী যেন দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। এমন সময় একটী বিংশতি বর্ষীয় যুবা সন্ন্যাসী দ্রুতবেগে রমণ পুর গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; যুবা ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে পরিশ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া রমণ পুরের জমীদার বাটীতে প্রবেশ করিলেন।

হায়! এখন আর রমণ পুরের সেই জমিদার গোবিন্দ রায়ের বাটীর সেই শোভা সৌন্দর্য্য কিছুই নাই, ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ গুলির ইষ্টক সমুহ খসিয়া পরিতেছে, বাটীর স্থানে স্থানে নানাবিধ তৃণ গুল্ম জন্মিয়া সগৌরবে বাটীস্থ পোষ্য বর্গের ন্যায় অবস্থান করিতেছে; বাটীতে লোক সমাগম নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কেবল দুই একটী কর্ম্মচারী ভিন্ন বাটীর মালিক আর কেহ বাটীতে অবস্থান করেননা; সেই কারু কার্য্য খচিত সুন্দর দালান গুলি এখন চামচিকার আবাস স্থান হইয়াছে।

পুত্র শোকে অধীর হইয়া বহুকাল যাবৎ গোবিন্দ রায় নিরুদ্দেশ

হইয়াছেন ; তৎপর কিছুদিন চন্দ্ররায় সানন্দে এ বাটীর মালিক হইয়া সুখ ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছিলেন, আবার অচীর কালমধ্যেই তাহার ভাগ্যলক্ষ্মী অপ্রসন্ন হওয়াতে জাল মোকদ্দমায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া কারাগার হইতে মুক্ত হয়। রাধানগরের দেবী-রাণী চন্দ্র রায়ের সকল বিষয়ের মালিক হইয়াছেন। দেবী-রাণী রাধানগরে অবস্থান করেন, কেবল তাঁহার দুই একটী কর্ম্মচারিমাত্র এই বাটীতে অবস্থান করিয়া থাকেন। যুবক দ্রুতবেগে বাটীর মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক বাটীর অবস্থা দর্শন করিয়াই কাঁপিয়া উঠিল ; তখন তিনি উচ্চৈস্বরে ডাকিয়া বলিলেন, "বাটীতে কে আছেন ?" কিন্তু কাহারই উত্তর পাইলেননা এইরূপে, অনেকক্ষণ ডাকা ডাকির পর একটী বৃদ্ধ আসিয়া রাগে গড়্ গড়্ করিয়া বলিল "তুমি কেহে বাপু ! দুপুর বেলা এসে জ্বালাতন কচ্ছ, যাও এখানে কিছু হবেনা, বেটাদের আর কোন কাজ নেই কেবল সন্ন্যাসী সেজে ভিক্ষা করবার ফিকির, বেটা নিশ্চয়ই ভণ্ড যোগী নতুবা এত অল্প বয়সে কি কেহ সন্ন্যাসী হয়"।

যুবক। আজ্ঞে আমি ভিক্ষারী নই।

বৃদ্ধ। তবে তুমি কি চাও।

যুবক। আজ্ঞে আমি কেবল আপনাকে কয়েটী কথা জিজ্ঞাসা করিব।

বৃদ্ধ। কি কথা বাপু বলে ফেল ! এখন দুপুর বেলা আমার দাঁড়াইয়া থাকিবার সময় নয়।

যুবক। আজ্ঞে এ বাড়ীটী কি জমিদার গোবিন্দ কুমার রায় চৌধুরী মহাশয়ের।

বৃদ্ধ। নাহে বাপু এ গোবিন্দ কুমার রায় চৌধুরীর বাড়ী নয়।

এ বাড়ী চন্দ্রকুমার রায় চৌধুরীর ছিল বটে ; কিন্তু সংপ্রতি তাহার সমস্ত সম্পত্তি ও এই বাটী দেবী-রাণী খরিদ করিয়াছেন।

যুবক। সেই চৌধুরী পরিবারের সমস্ত লোকজন কোথায় আছেন বলিতে পারেন ?

বৃদ্ধ। তাহারা কে কোথায় আছে কে জানে ? চন্দ্ররায় বাটী বিক্রয় করিয়া ও কতক দিন এখানে ছিলেন বটে ; কিন্তু সংপ্রতি সে পীড়িত হওয়ায় দয়াবতী দেবী-রাণী দয়া করিয়া তাঁহাকে তাঁহার রাধানগরের বাটীতে নিয়ে চিকিৎসা করাইতেছেন।

যুবক। দেবীরাণী কি রাধানগরেই অবস্থান করিয়া থাকেন ?

বৃদ্ধ। হা রাধানগরেই তাঁহার আসল বাটী।

"আচ্ছা তবে আমি এখন রাধানগরে চল্লেম" এই বলিয়া যুবক প্রস্থান করিল। পাঠক বোধহয় এ যুবক সন্ন্যাসীকে চিনিতে পারেন নাই। ইহার সহিত আপনাদের আলাপ নাই, কেবল নাম শুনিয়াছেন চিনিবেন কিরূপে, তবে ইহার নামেই পরিচয় পাইবেন ; ইনিই আমাদের গোবিন্দ রায়ের প্রাণ পুত্র সতীশ চন্দ্র। এত দিন পরে সেই নিরুদ্দেশ সতীশ চন্দ্র সন্ন্যাসীর বেশে বাটী ফিরিয়া আসিয়াছেন। এই সতীসের জন্যই এত ঘটনা ঘটিল। আজ সেই সতীশ বাটীতে আসিয়া নিজ বাটী চিনিতে পারিতেছে না। সতীশ যে এতদিন কোথায় কিভাবে ছিল পাঠক তা পরে সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

রমনপুর হইতে রাধানগর চারি ক্রোশের রাস্তা, সতীশ ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে, সেই চৈত্র মাসের প্রখর রৌদ্র মাথায় করিয়া দ্রুতবেগে রাধানগরের দিকে গমন করিলেন। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই রাধানগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

রাধানগরের দেবী-রাণীর প্রকাণ্ড বাড়ী আজ লোকজনে পরিপূর্ণ হইয়া ঝম্ ঝম্ করিতেছে। পাঠক আপনাদের সেই দুঃখিনী দেবীবালাই এখন অতুল সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়া দেবী-রাণী নামে পরিচিতা। আজ দেবীবালার সুখেরপরিসীমা নাই, আজ সে অতুল বিভবের অধিকারিণী হইয়া আবার শ্বশুর, শাশুড়ী স্বামী সকলই পাইয়াছে। যে শাশুড়ী ঘৃণার চক্ষে তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছিল, আজ সেই শাশুড়ীই কিনা তাহার অন্নে প্রতিপালিতা হইয়া তাহার নিকট ভয়ে জড় সড়। সংসারে এখন আর তাহার অনাদর নাই; সকলেই তাহাকে মান্য মাননা করে, ভালবাসে খাতির যত্ন করে, দাস দাসী চাকর চাকরাণীর অভাব নাই। সুখ সর্ব্বপ্রকারেই সুখ। শত শত লোক তাহার সহিত আত্মীয়তা কুটুম্বিতা করিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; শত শত লোক

তাহার কৃপার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টিত। যাহারা দিবা রাত্র গরচ্ছলে তাহার নিন্দা করিয়া বেড়াইত, আজ কি না তাহাদের মুখেহ দেবী রাণীর প্রসংশা ভিন্ন অন্য কথা নাই। হায় রে অর্থ তোমার অনন্ত মহিমা, তুমি যাহার প্রতি অনুগ্রহ কর সেই সৎ, সে নির্গুণ হইলে তাহার গুণের পরিসীমা থাকে না, আবার হে অর্থ! যাহার প্রতি তোমার কৃপা নাই, জগৎ মধ্যে সে নিতান্ত ঘৃণার পাত্র। তাহার গুণ কেহ দর্শন করে না, তাহাকে জন সমাজে সর্ব্বদাই হেয় হইয়া থাকিতে হয়। কাজেই দেবীবালার এত গুণ সত্বেও সে জন-সমাজে ঘৃণার পাত্রী হইয়াছিল। আজ আবার সেই দেবীবালাই লক্ষ্মীর কৃপায় জন সমাজে পরম আদরনীয়া ও সন্মানের পাত্রী হইয়াছে। এত ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়াও দেবীবালার অন্তরে অহঙ্কারের লেশ মাত্র নাই বরং সে সমস্ত বিষয়ের অধিকারিণী বলিয়া সকলের নিকট বিশেষ লজ্জিতা, শ্বশুর শাশুড়ী কি স্বামীর সহিত লজ্জায় মুখ তুলিয়া কথা বলিতে, সাহস করে'না, স্বামীর নামে সমস্ত বিষয় লিখা পড়া করিতে পিতাকে অনেক অনুরোধ করিয়াছে; গোবিন্দ রায় বলেন "মা আমি আর অধিক দিন এ স্থানে থাকিব না—সত্বরই কাশী-বাসী হইব, তখন যাহা হয় করিও" আর প্রবোধের ও ইহাতে বেশী অভিমত ছিল না। এই জন্যই এ পর্য্যন্ত উহা দেবীরাণীর নামে ছিল।

চন্দ্ররায় সর্ব্বশান্ত হইয়াছিলেন; এমন কি তাহার অন্ন সংস্থানের ও অন্য উপায় ছিলনা দেখিয়া; সে স্বপরিবারে দেবীরাণীর আশ্রয় লইয়াছিল, অর্থাৎ দেবীরাণীই তাহাকে যত্নের সহিত নিজ সংসারে আনিয়া রাখিয়া ছিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

আজ দেবীরাণী বড়ই অস্থীরা, বাটীর সকলেই ব্যতি ব্যস্ত, কারণ চন্দ্ররায় আজ অত্যন্ত পীড়িত। কারাগার হইতে নানা-প্রকার ক্লেশ ভোগের পর মুক্ত হইয়াও ভাবনায়-চিন্তায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন; কাজেই ক্রমে কঠিন রোগ আসিয়া তাহাকে অধিকার করিয়াছে। আজ চন্দ্ররায় দেবী রাণীর বাটীতে বিষম রোগের যন্ত্রণায় ছট ফট করিতেছেন। তাহার পদপ্রান্তে বসিয়া দেবীবালা তাহার অবস্থা দর্শন করিয়া অশ্রুজলে বক্ষঃ ভাসাইতেছে; দেবীবালার সেই ভাব দেখিয়া চন্দ্র রায়ের কারা-গারের কথা মনে পড়িল, তখনই মোহ-ঘোরে চেচাইয়া বলিয়া উঠি-লেন "দেবীবালা তুমি আবার এ পাপীষ্ঠের নিকট আসিয়াছ, শীঘ্র পলাও শীঘ্র পলাও, আমি যে তোমার সর্ব্বনাশের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলাম, তাহাকি তোমার মনে নাই।" গ্রহস্থিত অপরা-পর লোক এবং হরিদাস ভট্টাচার্য্যও প্রবোধ,সকলেই তাহাকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না বরং সে আবার চেচাইয়া বলিতে লাগিল, "প্রহরীগণ তোমরা আমাকে ফাঁসী দেও, আমি মহাপাপী আমার ফাঁসী হওয়াই উচিত"।

চন্দ্র রায়ের এ ভাব দর্শন করিয়া সকলেই ভয়ে তটস্থ হইয়া উঠিলেন; রোগের অবস্থা কঠিন ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ চিকিৎসক ডাকিতে লোক পাঠাইল। চিকিৎসকের আগমনের আশায় সকলেই উৎকণ্ঠিত ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, বেলাও প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় একটী নবীন সন্ন্যাসী আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। সকলেই যত্ন পূর্ব্বক তাহাকে বসিতে আসন দিয়া তাহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করি-

লেন। নবীন সন্ন্যাসী উপবেশন করিয়া বলিলেন, " রমণপুরের চন্দ্ররায় মহাশয় এস্থানে আছেন, আমি তাঁহার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিব।

" কেন চন্দ্ররায় আপনার কে হয় "

" তিনি আমার পিতৃব্য। সে অনেক দুঃখের কথা বহুকাল যাবৎ আমি দৈব বিড়ম্বনায় আত্মীয় স্বজনের দর্শনে বঞ্চিত ; এখন; তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলেই আমি অপর সকলের সংবাদ লইতে পারিতাম।" নবীন সন্ন্যাসীর কথা শ্রবণ করিয়া সকলেই এক দৃষ্টে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। হরিদাস ভট্টাচার্য্যের ও আর তাহাকে চিনিতে বাকি রহিল না, তিনি তৎক্ষণাৎ "সতীশ" বলিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিয়া নবীন সন্ন্যাসীকে দুই হস্ত দ্বারা জড়াইয়া ধরে বক্ষে স্থাপন করিলেন। একটা হুলস্থূল ব্যাপার পড়িয়া গেল। আজ গোবিন্দ রায় তাহার হারানিধি পাইলেন ; তিনি যাহার জন্য তাঁহার সোণার সংসার মাটী করিয়া কানন-বাসী হইয়াছিলেন, বহুদিন পরে আজ কি না সেই ধন অনায়াসে পাই-লেন। সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল। পাঠক নবীন সন্ন্যাসীকে চিনিলেন কি ? "এই সেই গোবিন্দ রায়ের প্রাণ পুত্র সতীশ।" সতীশ ক্রমে সকলের পরিচয় পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া নিজের দুঃখ কাহিনী সংক্ষেপে বলিতে লাগিল। সতীশ বলিল " আমি সন্ধ্যাকালে বাটী ফিরিতে ছিলাম, হঠাৎ দুই জন দস্যু আমাকে ধরিয়া আমার হাত মুখ বাঁধিয়া অনেক দূর নিয়া একটা মাঠের মধ্যে মৃত্তিকার নিম্নে অন্ধকার ময় গৃহে পুরিয়া রাখে। আমি দিবা রাত্র কেবল সেই স্থানে কাঁদিয়া কাটাইতে লাগিলাম, কোন প্রকারেই আর মুক্তির পথ দেখিতে

পাইলাম না। এইরূপে বহু দিন কাটিয়া গেল। আমার আহারের সময় কেবল একটী ব্রাহ্মণ আসিয়া আমাকে আহার্য্য দিয়া যাইত; কিন্তু কোন কথা বলিত না। তাহাকে কত অনুনয় বিনয় করিয়া কত কথা জিজ্ঞাসা করিতাম; কিন্তু কোন উত্তর দিত না। বহু দিন পর ভগবান আমার প্রতি সদয় হইলেন, সেই ব্রাহ্মণ আমার অনুনয় বিনয়ে আমাকে মুক্ত করিতে চাহিলেন; কিন্তু কয়েকটী প্রতিজ্ঞায় আমাকে আবদ্ধ করাইলেন, তিনি বলিলেন "তুমি উদ্ধার হইয়া বাটীতে যাইতে পারিবেনা, বাটীতে গেলে তোমার আবার বিপদ ঘটিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও বিপদ গ্রস্ত হইতে হইবে, কেননা তোমার পিতা সংসার ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, তোমার মাতাও উন্মাদিনী হইয়া গিয়াছেন, তোমার পিতৃব্য এখন সংসারের কর্ত্তা। তিনিই তোমাকে এই স্থানে আটক রাখেন, আবার তাহার নিকট গেলে নিশ্চয়ই তোমার বিপদ ঘটিবে, সঙ্গে সঙ্গে আমরাও মারা যাব, অতএব তুমি বাটী ন যাইয়া কাশীতে চলিয়া যাও," এই বলিয়া আমাকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া মুক্ত করিয়া দেন। আমি এই কয় বৎসর কাশীতে বাস করিয়া গুরুর আদেশ মত সংপ্রতি রমণপুরের বাটীতে যাইয়া জানিলাম, পিতা নিরুদ্দেশ, মাতা, ও উন্মাদিনী হইয়া কোথায় গিয়াছেন এবং পিতৃব্য মহাশয় ও দেবীরাণীর নিকট সকল সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া এখন এইস্থানে আছেন, তাই এখানে আসিয়াছি।"

চন্দ্ররায় রোগ শয্যায় শায়িত থাকিয়া সতীশের এই সমস্ত কথা নিবিষ্ট মনে শ্রবণ করিতেছিলেন। তিনি এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিতে করিতে আবার কাঁদিয়া উচ্চৈস্বরে বলিতে

লাগিলেন " সতীশ বাবা তুমি জীবিত আছ! তুমি আবার এ পাপীষ্ঠের নিকট আসিয়াছ, শীঘ্র পালাও আমিই যে বিষয়ের লোভে তোমাকে এত কষ্ট দিয়াছি, আমিই তোমাকে কারাগারে পুরিয়া তোমার সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিয়াছিলাম ; তুমি শীঘ্র পালাও এ নরাধমের মুখ আর দর্শন করিও না।" এই কথা বলিতে বলিতে আবার অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। গ্রহস্থিত কাহারই আর কোন কথা বুঝিতে বাকি রহিল না। তখন সতীশকে পাইয়া সকলেই আনন্দিত হইলেন সত্য ; কিন্তু চন্দ্র রায়ের অবস্থা দর্শন করিয়া সকলেই তাহার জীবনের প্রতি হতাশ হইলেন। চিকিৎসক আসিল ; তিনি নাড়ী টিপিয়া রোগের অবস্থা পরীক্ষা করিলেন, সকলেই ব্যাগ্রতার সহিত রোগীর অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন।

চিকিৎসক বলিলেন, : "জীবনের কোন ভয় নাই ; কিন্তু কতকটা উন্মাদের লক্ষণ দেখা যাইতেছে, বোধ হয় কোন রূপ শোকে দুঃখে অনুতাপে এরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, এখন এ সমস্ত চিকিৎসায় ইহার বিশেষ কোন ফল হইবে না। কিছু দিন পূর্ব্বে একটী ভদ্র গৃহস্থের স্ত্রীলোককে আমি এইরূপ উন্মাদ অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়া অতি যত্নের সহিত নিজ গৃহে নিয়া অনেক যত্নের সহিত তাঁহার অনেক চিকিৎসা করি ; কিন্তু কোনই ফল পাওয়া যায় না, সে কেবল সর্ব্বদাই "সতীশ প্রাণের সতীশ বলিয়া চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে।" আমি ক্রমে তাহার শোকে দুঃখে উন্মাদের কারণ বুঝিতে পারিয়া, তাহাকে আর কোন চিকিৎসাদি না করিয়া যত্নের সহিত নিজ গৃহে রাখিয়াছি, যদি কখন ও তাহার সেই শোকের

কিঞ্চিৎ লাঘবতা জন্মে তবেই রোগের প্রতিকার হইবে, নতুবা আর উপায়ন্তর নাই।

চিকিৎসকের কথায় সকলেরই চক্ষে জল আসিল। দেবীবালা "মা মা" বলিয়া চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল এবং কাতর ভাবে চিকিৎসককে বলিলেন "মহাশয় সত্বর তাঁহাকে লইয়া আসুন, তিনিই এই দুর্ভাগিনীর জননী।". তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের সহিত শিবিকা পাঠাইয়া দেবীবালা তাহার উন্মাদিনী জননীকে বাটী আনাইলেন।

উপসংহার

আজ দেবীরাণীর বাড়ীতে আনন্দে পরিপূর্ণ। গোবিন্দ রায় আবার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, জামাতা, ভাই সমস্ত পাইয়াছেন, সতীশের জননী আর এখন উন্মাদিনী নাই, তিনি যে জন্য উন্মাদিনী সে সমস্তই প্রাপ্ত হইয়াছেন, কাজেই এখন পুনঃ প্রকৃতস্থা হইয়াছেন। চন্দ্ররায় ও বিষম রোগের যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন।

এক দিবস গোবিন্দ রায় বসিয়া ক্রমে সকলকে নিকটে ডাকাইয়া বলিলেন, "তোমরা সকলে আজ আমার কয়েকটী কথা শ্রবণ কর" আমি বহুকাল পর্য্যন্ত নানাবিধ কার্য্য দ্বারা কেবল পাপই সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছি, আমার যে কি গতি হইবে জানিনা, যাহা হউক আমি এখন মনস্থ করিয়াছি যে সংপ্রতি কাশীবাসী হইব অতএব তোমাদিগকে বিষয় আসয় সম্বন্ধে যাহা বলিয়া যাইতেছি তদনুরূপ কার্য্য করিও। আমার রমন পুরের বিষয়াদি যাহা আমার পূর্ব্বে ছিল, তাহা কৌশল ক্রমে আমি সমস্ত রাখিয়াছি, সে সমস্ত বিষয় যদিও দেবীবালার নামে লিখা পড়া আছে তথাপি আমার বিবেচনায় তাহা দ্বারা দেবীবালার প্রয়োজন নাই। তদ্ব্যতীত আর যত সম্পত্তি দেবীবালার নামে আছে, তাহা দেবীবালারই থাকিবে। এই রমনপুরে সংপ্রতি চন্দ্ররায় এবং সতীশ যাইয়া সেই সম্পত্তি অৰ্দ্ধেক করিয়া ভোগ করিতে থাকুক।

এই কথা শ্রবণ করিয়া দেবীবালা বলিল "পিতঃ! এখন আর আমাকে সম্পত্তিভোগের কথা বলিবেন না, আমি দরিদ্রাবস্থায় শ্বশুর শাশুড়ীর অধীনা হইয়া থাকিতেই ভাল বাসী।

তখন চন্দ্ররায় ও বলিল " দাদা আর আমাকে সম্পত্তি ভোগের কথা বলিবেন না, আমি এখন বিষ তুল্য বিষয় ছাড়িয়া আপনার সহিত কাশী বাসী হইব।"

গোবিন্দ রায়ের কথা মতই সকল কার্য্য হইল; কিন্তু চন্দ্র রায় আর কিছুতেই ছাড়িলেন না, তিনি গোবিন্দ রায়ের সহিত স্বপরিবারে কাশী-বাসী হইলেন, সতীশ রমণ পুরের জমিদারির মালিক হইয়া সুখে সচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিলেন।

আর দেবীবালা। দেবীবালা রাধানগরের অতুল বিভবের অধিকারিণী হইয়া রাজরাণী উপাধী পাইয়া পরম সুখে শ্বশুর শাশুড়ী ও স্বামী এবং সেই সহচরীগণের সহিত বাস করিতে লাগিল। আর সেই বাল্য সহচরী গিরিবালা, যে দেবীবালার দুঃখের দিনে এক মাত্র দুঃখিতা হইয়াছিল। সেই গিরিবালার বহুদিনের নিরুদ্দেশ স্বামীকে দেবীবালা অনেক চেষ্টায় অনুসন্ধান করিয়া আনিয়া নিজ বাড়ীতেই যত্নের সহিত রাখিয়াছেন। সুখ সর্ব্ব প্রকারেই সুখ। কত শত শত দীন দুঃখী দেবীরাণীর অন্নে প্রতি পালিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কেবল বলিতেছে জয় মাতা দেবী রাণী।

সম্পূর্ণ।